দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দ্বেষ থাকলে
দেশ গঠন মুশকিল
— পৃঃ ২৩

ধর্মান্তরণের পর দলিত
হিসেবে সংরক্ষণের দাবি
যুক্তিসঙ্গত নয়— পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২৮ নভেম্বর, ২০২২।। ১১ অগ্রহায়ণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮ নভেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ভাষা সন্ত্রাসের ধাক্কায় নীচ আর বেহায়া রাজনীতিকের আঁতুড়ঘর পশ্চিমবঙ্গ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

হে মোর দুর্ভাগা বাঙ্গলা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

জনজাতি নায়ক বীরসা মুণ্ডার জীবন ও ঘটনার অবিস্মরণীয়তা ◻ রণেন্দ্র ◻ ৮

উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছে দেশের অর্থনীতি ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

মরু সংস্কৃতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকছেন ইরানের মহিলারা ◻ রক্তিম দাশ ◻ ১১

ধর্মান্তরণের পর দলিত হিসেবে সংরক্ষণের দাবি যুক্তিসঙ্গত নয় ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৩

বিশ্বনাথ মন্দিরের আমূল সংস্কার হিন্দুদের বহুদিনের স্বপ্নপূরণ ◻ আনন্দমোহন দাস ◻ ১৫

প্রান্তিক মানুষও হতে পারেন ক্ষুদ্রশিল্পপতি কিংবা ছোটো ব্যবসায়ী ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৭

দ্বেষ থাকলে দেশ গঠন মুশকিল ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

অখিল গিরির মুখনিঃসৃত বাণী এবং সমাজ ও রাজনীতির উপর তার প্রতিক্রিয়া ◻ বিমল শংকর নন্দ ◻ ২৬

রাজা সুহেলদেবের কারণে দেড়শো বছর বন্ধ ছিল ইসলামি আগ্রাসন ◻ উত্তম মণ্ডল ◻ ৩১

নেতাজীকে বাঁচাতে স্বামীকে হত্যা করেছিলেন নীরা আর্য ◻ সুদীপ কুমার ঘোষ ◻ ৩৩

সস্তার মোহে চীনা পণ্য ক্রয় ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করারই নামান্তর ◻ অম্লান কুসুম ঘোষ ◻ ৩৫

গোরুর দুধে সোনার নেপথ্যে অরিফেরাস প্ল্যান্ট ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৮

ইতিহাসের কিংবদন্তী কিংবা কিংবদন্তীর ইতিহাস ◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ৪৩

আমার দেখা চার বলিদানীর ত্রিপুরা ◻ শ্যামলী বসু ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৫ ডিসেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৫ ডিসেম্বর
২০২২

ভালোবাসার ৩৫ টুকরো

শ্রদ্ধা ওয়াকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ এখন তোলপাড়। প্রেমিক আফতাব আনসারি পুনাওয়ালার সঙ্গে দিল্লিতে থাকতেন শ্রদ্ধা। সেখানেই শ্রদ্ধাকে খুন করে আফতাব। তারপর দেহটি ৩৫ টুকরো করে ফ্রিজে রেখে দেয়। এই ঘটনায় লাভ জিহাদের তত্ত্ব আবার নতুন করে উঠে এসেছে। দেশে লাভ জিহাদ নেই বলে দাবি করতেন যারা তারা কী বলছেন জানার আগ্রহ সর্বত্র। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। লিখবেন দেবযানী ভট্টাচার্য, শ্রীতমা পাল প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ক্ষুদ্র রাজনীতির কারবারিরা দেশের পক্ষে ভয়ংকর

রাজর্ষি জনকের জ্ঞানসভায় অষ্টাবক্র মুনিকে আসিতে দেখিয়া কতিপয় পণ্ডিত উপহাস করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। মুনিবর রাজর্ষি জনকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানসভা মনে করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এখন দেখিতেছেন ইহা একটি কষাইদের জমায়েত মাত্র। কষাইরা যেইরূপ চর্ম ও মাংস দেখিয়া বধ্য প্রাণীটির মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে, ইহারাও তদ্রূপ। ইহা তো পৌরাণিক যুগের একটি উপাখ্যান। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখনও কষাইসদৃশ বহু রাজনীতিক সগৌরবে বিরাজ করিয়া দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। জাতপাতে দীর্ণ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে ভারতবর্ষকে প্রায় হাজার বৎসর পরাধীনতার কাল কাটাইতে হইয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা বহুশত বৎসর শুধু ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, কিয়দংশ দেশবাসীর মন ও মস্তিষ্ককে বিকৃত করিয়া বৌদ্ধিক দাসে পরিণত করিয়াছিল। মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও তাহাদের উত্তরসূরীরা সেই দাসসুলভ মানসিকতার পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালেই কমিউনিস্টরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিবার দাবি জানাইয়াছিল। জিন্নার ভারত ভাঙিয়া পাকিস্তানের দাবির জোরালো সমর্থক ছিল ইহারাই। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা 'এক জাতি এক প্রাণ' শুধু রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। মহাজাতি গঠন করিবার জন্য তাহাদের কোনোপ্রকার অ্যাজেন্ডা অথবা মন মানসিকতা কোনোটাই ছিল না। ক্ষমতা ভোগ করিবার জন্য প্রথমাবধিই তাহারা জাতপাতভিত্তিক রাজনীতিকেই হাতিয়ার কারিয়াছে। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন হইতেই কংগ্রেসের সহিত কমিউনিস্টরাও জাতপাতের বিষয়টি মাথায় রাখিয়া প্রার্থী বাছাই করিয়াছে এবং অদ্যাবধি তাহাই করিতেছে। এইরূপ মন ও মানসিকতার রাজনীতি ভারতে দশকের পর দশক ধরিয়া চলিতেছে। ইহারই ফলস্বরূপ দেশের রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন নহে; দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা ভোগ করিবার পন্থা মাত্র। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করিয়া দেশকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করা।

সংবিধানে ভারতকে জাতিভেদহীন সমাজ ব্যবস্থার একটি রাষ্ট্র বলিয়া মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। আবার একই সঙ্গে সংবিধানের নানান ধারা-উপধারায় জাতপাতের ধারণাকেও স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর্থিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থেই সংবিধান প্রণেতারা এইরূপ করিয়াছিলেন। ইহারই সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকগণ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে সংবিধানের মূল ভাবনাকে বিপথগামী করিয়াছেন। জাতিগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক নেতাদের ভোটব্যাংকে পরিণত হইয়াছে। ফলস্বরূপ দেশ জাতপাতহীন রাষ্ট্রে উন্নীত হইবার পরিবর্তে গোষ্ঠী সংবলিত সংকীর্ণ স্বার্থে দীর্ণ হইয়াছে। মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বৈষম্য প্রদর্শনের মানসিকতা বেগবতী হইয়াছে। স্বার্থ জর্জরিত তথাকথিত নেতাদের যেন দেশ ও জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিতেই আনন্দ। জাতি গঠনের প্রয়াস দেখিলেই তাহারা প্রমাদ গণিতেছে। ১৯২৫ সাল হইতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক দ্ব্যর্থহীন ভায়ায় বলিতেছেন হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব। ইহা প্রমাণিত সত্য যে বিগত চল্লিশ হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর ডিএনএ এক ও অভিন্ন। ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকলেই জাতিগতভাবে হিন্দু। ইহাতেই স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিরা আতঙ্কিত। এই রাজ্যেরই অধুনা প্রাক্তন এক আমলা জাতি বিদ্বেষের কাজটি সুচারুরূপে করিতেছেন। দুর্গাপূজা সমাগত হইলেই ইনি 'জনজাতিরা হিন্দু সমাজের নহে' বলিয়া কাহিনি সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি রাজ্যের এক মন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপতির রূপ ও রং লইয়া কটাক্ষ করিতেও পিছপা হন নাই। এই ভয়ংকর রাজনীতির কারবারিরা অনবরত বিষ উদ্‌গীরণ করিতে থাকিলে দেশ গঠনের কাজটি বিঘ্নিত হইবে। দেশ পুনরায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িবে। ইহারা ক্ষুদ্র রাজনীতির জন্য আর কত নীচে নামিবেন তাহা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

সুভাষিতম্

জ্যেষ্ঠত্বং জন্মনা নৈব গুণৈর্জ্যেষ্ঠত্বমুচ্যতে।

গুণাৎ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধং দধি ঘৃতং ক্রমাৎ।।

মহানতা জন্ম থেকে হয় না। মহানতা গুণের দ্বারা প্রাপ্ত করতে হয়। যে রকম দুধ থেকে দই ঘি ক্রমানুসারে হয়ে থাকে।

ভাষা সন্ত্রাসের ধাক্কায় নীচ আর বেহায়া রাজনীতিকের আঁতুড়ঘর পশ্চিমবঙ্গ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'হোঁদল কুতকুত' বলে ডাকেন। প্রধানমন্ত্রীকে 'কোমরে 'দড়ি পরিয়ে' ঘোরানোর হুমকি দেন। ফলে সেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীকুল যে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন রাষ্ট্রপতির 'রূপ-রঙের অমর্যাদা' করবেন তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

আচার্য চাণক্যের কথায় যার শরীরে বিষ তার বাক্যেও বিষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা সন্ত্রাসে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। বিষাক্ত সাপ আর নীচ ব্যক্তির মধ্যে সাপকেই বেছে নিতে বলেছিলেন চাণক্য। সাপ একবার দংশন করে আর নীচ ব্যক্তিরা বার বার। একসময় সিপিএম নেতারাও মমতার বিরুদ্ধে কুৎসিত আর কুরুচিকর মন্তব্য করতেন। হোঁদল কুতকুত কুরুচিকর হলে কাউকে 'দাঁড়কাক' বা কোনো মহিলা মন্ত্রীকে 'পায়ের নীচে রাখি' বলাও সমান গর্হিত তা অনেকসময় বিরোধীরাও মনে রাখেন না। লজ্জাকর ভাবে তাদের উপর এতটাই প্রভাব পড়েছে মমতার।

রাজধর্ম বলে, আচরণেই ব্যক্তির বংশ পরিচয়। আর বাক্য বা বুলিতে কুল আর দেশের পরিচয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওসব মানেন না। চারবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আর ছ'বারের সাংসদ মমতা। বারো বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। তাঁর কাছে কোন কোন রাষ্ট্রীয় পদের কী কী মর্যাদা তৃণমূলের নেতাদের তা জানান না মমতা। কেবল বিরোধিতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন ভাষা সন্ত্রাস। শোনা যায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে অনুগত বানাতে 'ঢপ দেবেন না 'বা' মিথ্যা বলবেন না' জাতীয় চালু চটুল আর কটু বাক্য ব্যবহার করেছিলেন মমতা।

নেতা মন্ত্রীরা রাজনৈতিক কুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে যা হয় তাই ঘটছে এ রাজ্যে। অনেকটা ইচ্ছা করেই মমতা হরিণকে হাল চাষে আর ছাগলকে যব মাড়াতে ব্যবহার করছেন। কারণ এটাই। তিনি সব কাজ করবেন। বাকিরা ফাউ আর দুধ-ভাত। এটা প্রমাণ করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তাঁর কুবাক্যে রাজ্য মন্ত্রীসভা ভীত সন্ত্রস্ত। সরকারে না থাকা বিরোধী নেত্রী মমতাকে আমি কোনোদিন কুবাক্য ব্যবহার করতে শুনিনি। শাসক হয়ে মমতা ভাষা সন্ত্রাসের হোতা আর উদ্‌গাতা। তাঁর আশকারাতেই বেড়ে উঠেছে অখিল গিরির মতো অপ্রাসঙ্গিক নেতারা। ধুলো ময়লার থেকেও তারা অবাঞ্ছিত। মমতা নিজে যে দোষে দুষ্ট অন্যকে সে দোষ স্খালন করার

> **শাসক হয়ে মমতা ভাষা সন্ত্রাসের হোতা আর উদ্‌গাতা। তাঁর আশকারাতেই বেড়ে উঠেছে অখিল গিরির মতো অপ্রাসঙ্গিক নেতারা। ধুলো ময়লার থেকেও তারা অবাঞ্ছিত। মমতা নিজে যে দোষে দুষ্ট অন্যকে সে দোষ স্খালন করার নিদান দেবেন কী করে?**

নিদান দেবেন কী করে? কুবাক্য আর নাটুকেপনার শিকার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সৌগত রায়ের মতো বৃদ্ধ নেতারাও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ঘিরে অখিল গিরির লজ্জাকর মন্তব্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন মমতা। কতটা অনুতাপ আর কতটা কৌশল তা নিয়ে সন্দেহ আমার রয়েছে। তার বড়ো প্রমাণ গিরিকে একদিনের জন্য হলেও মন্ত্রীসভা থেকে সরাননি মমতা। লিপ সার্ভিস বা শুকনো আশ্বাসে চিরকাল পারদর্শী মমতা। মমতা জানেন তাঁর নেক নজরে আসতেই বেহায়াপনা আর নীচ কাজে লিপ্ত হন নেতারা। যে ভাষা সন্ত্রাসের খেলা মমতা শুরু করেছেন তা সহজে থামবে না। আগামীতে তার পারদ আরও চড়বে।

মমতা বলয় : মন্ত্রী চোর হিসেবে অভিযুক্ত। জাতীয় নেতা গোরু পাচারকারী। পরিবারের সদস্যরা বেআইনি সোনা আর কয়লা পাচারকারী। আমলা চাটুকার। পুলিশ প্রশাসন পারিবারিক চাকর। এদের নাহি লাজ নাহি অপমান।

অমৃতভাষণে এ দেশের বহু রাজনীতিক পটু। মমতা রাজ্যে তার রমরমা। অনেকে এ রাজ্যকে বেহায়া রাজ্য তকমা দিয়েছেন। মমতা বেহায়াদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন। আশকারা দেন। অনৈতিক কাজ করে তারা দুর্বল হয়। তাদের শাসন করতে মমতার সুবিধা হয়। এই সব দুর্বল 'নল রাজাদের' শরীরে 'কলি' প্রবেশ করিয়ে দেন মমতা। প্রতিদিন নতুন করে তৈরি করেন একরকম দাসের শ্রেণী। সব শাসকই তাই চান। তফাত কেবল মমতা চান তোষণ আর স্বজনপোষণ, অন্যরা সরকারি বশীকরণ। ▯

হে মোর দুর্ভাগা বাঙ্গলা...

সর্বত্রখ্যাতেষু দিদি,

গুজরাট ঘুরে এলাম। একজন নামি সাংবাদিকের সঙ্গী হয়ে। অনেক কিছু দেখলাম দিদি। আপনি শুনলে বলবেন আদেখেলে। সত্যিই তাই। নিজেকে আদেখলে মনে হলো। প্রথমে আমেদাবাদ, তার পরে গান্ধীনগর, সুরাট, চিত্রকূট। অনেক ঘুরেছি দিদি। কত চওড়া চওড়া রাস্তা দিদি, কত কারখানা। কত বড়ো বড়ো বাড়ি। শুধু শহরে নয় দিদি, প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েও দেখেছি কত কাজ হচ্ছে। নিজেকে অনেক ছোটো মনে হচ্ছিল উন্নয়ন দেখে। তবে আমিও কম যাই না। মনে মনে বলেছি, আমাদের নেতাজী, স্বামীজী আছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন।

শুনে ওরা কী বলল জানেন? বলল, আমাদেরও গান্ধীজী আছেন, সর্দার প্যাটেল আছেন। নরেন্দ্র ভাই মোদী আছেন। তখনই আমি মোক্ষম অস্ত্রটা দিলাম। বললাম, আমাদেরও দিদি আছেন।

সত্যি দিদি, বাঙ্গালি টোলায় গিয়ে এমন বলাটা যে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ওরা আপনার নাম জানে। কিন্তু ওরা না কেমন ব্যাঁকা চোখে দেখল। বলল, দিদি মানে ওই চপশিল্পের দিদি? যিনি কাশফুলের পাশবালিস বানান। যাঁর ভাইয়ের নাম অনুব্রত, পার্থ, ববি— এই সব? আমি চুপ করে ছিলাম দিদি। আমি মিনমিন করে বললাম, ববিদাদা তো আর বেশিদিন জেলে থাকেননি। ওঁর নাম টানছেন কেন? ওরা বলল, আপনার ববিভাইকে ওরা অনেক দিন থেকেই চেনে। গুজরাটে ববিদাদা বিখ্যাত মিনি পাকিস্তান বলার জন্য।

আসলে পেশা, চাকরি কিংবা রুটি রুজির টানে আমেদাবাদে থাকলেও ওঁরা মনে প্রাণে বাঙ্গালি। ওখানে একটা কালীপুজো করেন ওঁরা। বাঙ্গলায় চাকরি বিক্রি দুর্নীতির কথা ওদের মুখস্ত। আমি থাকার সময়েই অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার মৃত্যু হয়েছিল। তাতে ওঁদের চোখেও জল দেখেছি দিদি। মানে এখানে কাজ নেই বলেই ভারতের ম্যাঞ্চেস্টারে ওরা থাকেন কিন্তু মনে প্রাণে বাঙ্গলাকে ভালোবাসেন। মানে নিজের মাটি ভাবেন। বছরে, দু'বছরে একবার হয়তো আসেন কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় কাজের শেষে টিভি চালিয়ে বাংলা খবর দেখেন, শোনেন। আর তাতেই ওঁরা সব জানেন। আর তাতে জানেন তো দিদি, সত্যি বলছি, আপনার প্রতি একটুও শ্রদ্ধা নেই।

না দিদি, অখিল গিরিকে ওঁরা চেনেন না। নামটা ইদানীং শুনেছেন। তবে গুজরাটিরাও বলছেন, আপনার মন্ত্রী। আসলে গুজরাটি অস্মিতা যে কী উচ্চস্তরের সেটা দেখে এলাম। সেই সঙ্গে দেখলাম মোদীর রাজ্যের মানুষেরা দেশকে কতটা ভালোবাসেন, কতটা শ্রদ্ধা করেন। ওখানকার লোকেরা খুব কাজ করেন। বলেন, অর্ধেকটা করি নিজের জন্য আর অর্ধেকটা দেশের জন্য। তাতে নিজেদেরও ডবল লাভ।

> **ক্ষমা চাওয়াটা নাকি লোক দেখানো। ওটাও রাজনীতি। আসলে ওই 'অসভ্য' লোকটাকে মন্ত্রিসভায় রেখে দিয়ে দিদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা বলেছে বেশ করেছে। আসলে ওটাই দিদির মনের কথা।**

যাক দিদি, যে কথা বলছিলাম। সবাই নিন্দা করছে জানেন। আমাকেও বলল, দেশের রাষ্ট্রপতির এমন অপমান দেখে আপনিও কি প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন? আমি বললাম, না। আসলে...। শেষ করতে পারলাম না। কী অজুহাত দেব? বললাম, গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ হয়েছে। জেলায় জেলায় মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। ওরা বললেন, সে তো সাধারণ মানুষ নেমেছেন, বিজেপির লোকেরা নেমেছেন। আপনারা কী করলেন? কলকাতাকে তো সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে গর্ব করেন আপনারা। কিন্তু সেখানকার বিশিষ্টরা কী করলেন? একজন মহিলাকে এই ভাবে অপমান মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে? তিনি জনজাতি বলে? গায়ের রং নিয়ে, রূপ নিয়ে কোনও ভদ্র সমাজ আলোচনা করে? সেটাও আবার দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারীকে নিয়ে?

জবাব দিতে পারিনি দিদি। তবে এটা জোর গলায় বলেছি, দিদি তো ক্ষমা চেয়েছেন। দিদির দলও তো ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু এর পরের প্রশ্নটার জবাব ছিল না দিদি। আপনি শিখিয়ে দেবেন প্লিজ। এর পরে গুজরাট গেলে জবাবটা দিয়ে আসব।

বলল, ক্ষমা চাওয়াটা নাকি লোক দেখানো। ওটাও রাজনীতি। আসলে ওই 'অসভ্য' লোকটাকে মন্ত্রিসভায় রেখে দিয়ে দিদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা বলেছে বেশ করেছে। আসলে ওটাই দিদির মনের কথা। সেটা না হলে, সরিয়ে দিলেন না কেন? ওদের কথা মতো, দিদি আপনি কি সত্যিই অখিলকেও সম্পদ মনে করেন? □

অতিথি কলম

জনজাতি নায়ক বীরসা মুণ্ডার জীবন ও ঘটনার অবিস্মরণীয়তা

রণেন্দ্র

'বীর বীরসানে বাঘ মারা' বীর বিরসা এইমাত্র বাঘ হত্যা করল। আমার কৈশোর অবস্থায় বিদ্যাভ্যাসকালে শোনা দু'একটি মনে থেকে যাওয়া কথার মধ্যে এটি অন্যতম। এর কারণ মূলধারার ইতিহাসবিদরা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে সমাজবাদী রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রায় কেউই ইতিহাসের পাতায় ভারতীয় উপজাতি, জনজাতিদের অধিকার রক্ষা নিয়ে বীরসার লড়াই ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ রাখেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে জন্মানো বীরসা প্রায়শই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন যতদিন না তিনি একজন পরিপূর্ণ জনজাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী নেতা হয়ে উঠলেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে সি ঝা যখন তাঁর অন্যতম সেরা কাজ 'কোল রিভোল্ট' অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে উপজাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ প্রকাশ করলেন, মত সামনে এল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল প্রথম ১৮৩১-৩২ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৮৬০-এর দশকে। শ্রী ঝা প্রথম এই বিদ্রোহকে জনসমক্ষে যথাযথভাবে নিয়ে আসার পর তাঁর ছাত্র কুমার সুরেশ সিংহ একে এগিয়ে গিয়ে বীরসা মুণ্ডার আন্দোলনের ব্যাপকতায় প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর বিবরণ বিশেষ করে প্রামাণ্য বলে ধরা হয় এই কারণে যে শ্রী সিংহ পরবর্তী সময়ে একজন আইএএস আধিকারিক হন ও বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহের মূলকেন্দ্র বিহারের 'খুন্তি' অঞ্চলেই দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। তাঁরই ইংরেজিতে লেখা বই Dust storm ও Hanging Mist এবং পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে 'বিরসা মুণ্ডা ও তাঁর লড়াই' বইটি প্রথম গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্যভাবে বীরসার সময় ও জীবনের দলিল তুলে ধরে।

১৮৭৪-এর সময় বরাবর একটি গরিব চাষির ঘরে জন্ম নেওয়া বীরসা চালাকাড অঞ্চলে তাঁর কাকার বাড়িতে জীবন ধারণের জন্য থাকতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি নিষ্ঠুর দারিদ্রের আক্রমণ সহ্য করে বহুদিন নিরন্ন থাকতেন। ওই বইটি থেকেই জানা যায় দারিদ্রের কারণে পেটের দায়ে তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এক উদ্ধারকর্তা ও প্রাণপুরুষ হয়ে 'উলগুলান' বা সামগ্রিক বিদ্রোহের ডাক দেন। এখানে প্রশ্ন থাকে তাঁর এবং সম্প্রদায়ের অনেকের ১৮৮৬ সালের সময়ে ধর্ম পরিবর্তনকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় খুব ধুমধাম করে পালন করেছিল। অথচ এই পেটের দায়ে ধর্মান্তরণ উপজাতি সম্প্রদায়ের টিকে থাকার কারণে বাধ্য হয়ে করা। এই সময় তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাদের পিতৃপুরুষের ভূমি জমিদারি প্রথার অত্যাচারে যা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও ফলস্বরূপ তারা নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছিল তা ফেরত দেওয়া হবে।

প্রাথমিকভাবে বীরসা মিশনারিদের বিশ্বাস করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি মিশনারি স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের মোড় ঘোরানো ঘটনা। আর এর থেকেই জন্ম নেয় তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'সাহেব সাহেব এক টুপি' অর্থাৎ অত্যাচারী ব্রিটিশ যাদের জন্য তারা নিরন্ন আর মিশনারি তারা এক ও অভিন্ন আর তাদের টুপি এক। এর থেকেই উপজাতি সম্প্রদায়ের মনে ব্রিটিশ ও মিশনারি বিরোধী বিদ্বেষের বীজের প্রথম উন্মেষ হয়।

গত বছর থেকে বর্তমান সরকার ১৫ নভেম্বরকে বীরসা মুণ্ডার জন্ম দিবস স্মরণে 'জনজাতি গৌরব দিবস' হিসেবে পালন করার ঘোষণা করেছে। আর এই তারিখেই ভারতের প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'উলিহাতু' যেখানে বীরসা মুণ্ডা জন্মেছেন বলে জানা যায় সেখানে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এসেছেন। ইতিহাস নতুন করে রচিত হচ্ছে।

বীরসা নিজে উপজাতি সম্প্রদায়ের কর্তা যাদের সর্দার বলা হতো তাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৮৫৮ ও ১৮৯৬ সালে ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের নীরব কিন্তু প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ানোয়। এই সর্দারদের পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটরা ও আদালতে তাঁদের দুর্দশার বিবরণ তুলে ধরে দীর্ঘ আবেদন পত্রগুলির প্রতিবাদ প্রক্রিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। এই প্রতিবাদ পত্রগুলির মধ্যে তাঁরা সব সময় তাদের অপহৃত জমি প্রত্যর্পণের দাবি করতেন। কিন্তু এগুলি সবই বধিরের কানে বলার মতো। রাঁচি গেজেটের তথ্য অনুযায়ী উপজাতি সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র মানুষেরা আইনি পথে তাদের ন্যায্য পুনরুদ্ধার করতে শুধুমাত্র উকিল, কেরানি, আদালত কর্মীদের পেছনে লক্ষাধিক টাকার ওপর খরচ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শোষণের মাত্রা ছিল এতটাই ভয়াবহ। উপজাতিদের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই ভাবে ভেঙে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকলেও এর বিরুদ্ধে বাধাদান ১৮৮৬ অবধি তবুও শান্তিপূর্ণই ছিল।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬-এর সামাজিক পরিবেশে বীরসা কিছুটা অধ্যাত্মপ্রবণ হয়ে জনগণের রোগ যন্ত্রণা সারাবার চেষ্টায় রত হন। এর মাধ্যমেই তিনি এক অসীম দৈব শক্তির অধিকারী হয়েছেন এমন প্রচারিত হয়ে যায়। তিনি এ সময় নিজের মতো করে একটি ধর্মমতও প্রবর্তন করেন যার নাম 'বীরসাইত।' শোনা যায় এই ধর্মমত ছিল খ্রিস্টীয় ও বৈষ্ণব ধর্মমতের সংমিশ্রণ। বীরসা নিজের শরীরেও হলুদ মেখে থাকতেন যাতে তাঁকে ঘিরে সর্বদা একটা আলাদা

আকর্ষণ থাকত। এখানে আমরা মানুষটির মনের গভীরে অনুসন্ধান করলে একজন অভিজ্ঞ সামাজিক কৌশলকারীর সন্ধান পাব। তাঁর তীব্র ইচ্ছা ছিল মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের তা সামাজিক ভাবেই হোক বা ধর্মীয় পন্থার মাধ্যমেই হোক।

ঊনবিংশ শতাব্দীটির শেষ দশকটি এই সূত্রে ভারতব্যাপী বহুবিধ বিদ্রোহের রূপ দেখেছিল। গোদাবরী অঞ্চলে আল্লুরি সীতারাম রাজ্জু, রাজস্থানে ভিল সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দগিরির অধীনে বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল। একইভাবে বর্তমান ছত্তিশগড় অঞ্চলে ঘুর বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটেছিল। এগুলির ফলাফল খুব প্রভাব যে ফেলেছিল বলা যায় না। আগে ঘটী উপজাতি সম্প্রদায়ের সর্দারদের নীরব বিদ্রোহের ব্যর্থতা বীরসার ওপর প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। এরপরই এল ১৮৯৫ সাল তখনই বীরসা তার অসংখ্য সমর্থকদের নির্দেশ দিলেন তাদের নিজেদের জমির কোনো খাজনা না দেওয়ার। তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেই তিনি এই চরম আদেশ দেন। এই সময় বীরসার ঘোষণা ও বক্তব্য রাখার ধরনেও সমূহ পরিবর্তন লক্ষিত হলো। তিনি জানালেন ধর্মান্তরিতদের ওপর ও দেশের ওপর চেপে বসা বাইরে থেকে আসাদের (ইংরেজ) ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না। এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৮৯৫ সালের ২২ আগস্ট ওই অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অপরাধে ইংরেজ শাসক তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

হাজার হাজার বীরসা সমর্থক 'খুন্তিকে' প্রায় অবরুদ্ধ করে দেয় যেখানকার আদালতে তাঁর বিচার চলছিল। ২ বছর কারারুদ্ধ থাকার পর তিনি ছাড়া পান, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন কোনোভাবেই নেভেনি। বীরসা একাধারে ব্রিটিশ প্রশাসন ও অন্যদিকে মিশনারিদের কাছ থেকেও তাদের অপহৃত জমি নিঃশর্ত ফেরত চান। তিনি আন্দোলন চালিয়ে মুণ্ডা উপজাতিদের আরও সংগঠিত করতে থাকেন। তারাই যে জমির প্রকৃত মালিক এটা প্রমাণ করাই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এর চূড়ান্ত পরিণতিতে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অস্ত্র তির ধনুক নিয়ে তাঁরা ইংরেজ শাসককে আক্রমণ করে। ক্রমে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। খুন্তি থানার একটা অংশ সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ প্রত্যাক্রমণ করতে দেরি করেনি। বীরসার অসংখ্য সমর্থক ইংরেজের গুলিতে মারা যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল ওখানকার 'সেল রাকাব পাহাড়ে'। কেননা আক্রমণের মুখে মুণ্ডারা ওখানে আত্মগোপন করেছিল। বীরসা মুণ্ডা এর ফলস্বরূপ ১৯০০ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। এর মাত্র কয়েক মাস পরেই তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ও অত্যাচারে কারাগারেই মারা যান।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড নম্বর সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বীরসার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় জনজাতিরা স্বাভাবিকভাবেই চরম ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়। ভীত ইংরেজ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তারা জমির মূল মালিক মুণ্ডা ও অন্য উপজাতিদের জমির 'রেকর্ড অব রাইটস্' তৈরি করে তাদের মালিকানা স্বীকার করে। ১৯০৮ সালে ছোটোনাগপুর টেনান্সি আইন পাশ হয়। এর প্রভাব আজকের ঝাড়খণ্ডের ওপরও রয়েছে। বর্তমানে উপজাতিদের জমি জায়গা বিক্রির ওপর নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। এ সবই বীরসার আন্দোলনের অন্তিম পরিণতি।

গোটা জীবন সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণমূলক সংগ্রাম করে অকালে জীবন বিসর্জন দেওয়ার পরও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উল্লেখ ছাড়া বীরসার কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। ১৯৮২ সালে ওড়িশার রৌরকেল্লায় তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়! স্থানটি তাঁর বিদ্রোহস্থল খুন্তি থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অন্য একটি রাজ্যে। মূর্তি নির্মাণ কোনো সরকারি প্রচেষ্টায় হয়নি। দিন মজুরেরা পুলিশের প্রবল বাধার মুখেও তাদের আরাধ্য মানুষটির মূর্তি নির্মাণ করে।

এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ার পর লোকসভায় মুণ্ডার একটি প্রতিকৃতি রাখা হয় ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৮ সালে মূর্তিও স্থাপিত হয়। গত বছর থেকে বর্তমান সরকার ১৫ নভেম্বরকে বীরসা মুণ্ডার জন্ম দিবস স্মরণে 'জনজাতি গৌরব দিবস' হিসেবে পালন করার ঘোষণা করেছে। আর এই তারিখেই ভারতের প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'উলিহাতু' যেখানে বীরসা মুণ্ডা জন্মেছেন বলে জানা যায় সেখানে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এসেছেন। ইতিহাস নতুন করে রচিত হচ্ছে।

(লেখক প্রাক্তন আইএএস)

শোকসংবাদ

প্রবীণ স্বয়ংসেবক কৃষ্ণকুমার সাভারওয়াল গত ৩০ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর বড়দা প্রয়াত জগদীশজী শহিদ মিনার শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

স্বয়ংসেবক ব্রজভূষণ সিংহের (পিন্টু) মাতৃদেবী চন্দ্রকান্তা দেবী গত ১১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক অধুনা মালদা নগরের সিঙ্গতলা প্রভাত শাখার কার্যবাহ দিবাকর ঘোষের মাতৃদেবী বীণাপাণি ঘোষ গত ২১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পরিবারের সবাই স্বয়ংসেবক।

উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছে দেশের অর্থনীতি

কোভিড পরিস্থিতির ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভারতের অর্থনীতি। গত জুনের শেষে ব্রিকস বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন— 'অতিমারী পরিস্থিতিতে যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলায় আমরা ভারতে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের নীতি গ্রহণ করেছি। এই দিশায় ভারতের অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি বর্তমানে চোখে পড়ার মতো। চলতি বছর আমরা ৭.৫ শতাংশ হারে উন্নয়নের আশা করছি, যা আমাদের দ্রুত উন্নয়নশীল মূল অর্থনীতির দিকেই পরিচালিত করছে।' তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি যে নিছক কথার কথা ছিল না, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের বৃদ্ধিতে তার প্রমাণ মিলেছে।

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পূর্বাভাসে আগেই জানা গিয়েছিল, চলতি অর্থবর্ষে ভারত বিশ্বের দ্রুততম অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দেশ হয়ে উঠতে না পারলেও এদেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার অন্য অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। চলতি আর্থিক বছরে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার আশা করা গিয়েছিল ৮.১ শতাংশের মতো থাকবে। কিন্তু অর্থবছরের অর্ধেকসময় পার করেও দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার আপাতত ৬.৯ শতাংশে আটকে রয়েছে। পাশাপাশি চীন, আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডের চেয়ে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার কিন্তু যথেষ্টই বেশি। প্রসঙ্গত, চীনে ৪.৪ শতাংশ, আমেরিকায় ২.৫ শতাংশ, ইংল্যান্ডে ৩.৬ শতাংশ হারে চলতি বর্ষে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নাগেশ্বরন অন্যান্য উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা টেনে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়তা এবং স্থিতিশীলতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'গোটা বিশ্বের সব উন্নত দেশগুলি মূল্যবৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে। এমন সময়ে আমরা মূল্যবৃদ্ধির চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি।' নাগেশ্বরন এও আশা প্রকাশ করেন যে, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড অনুমান করছে ২০২৭ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৯০ লক্ষ কোটি) জিডিপি স্পর্শ করবে ভারত। সম্প্রতি ফোর্বসের এক সম্মেলনে ভারতের এই আর্থিক বৃদ্ধিকে চমৎকার তথ্য পরিসংখ্যান সহযোগে বুঝিয়েছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। তাঁর বক্তব্য : 'স্বাধীনতার পর ৫৮ বছর লেগেছে ১ লক্ষ কোটি ডলারের জিডিপি অর্জন করতে, এরপর ১২ বছর লেগেছে ২ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হতে, আর সেখান থেকে ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি হতে লেগেছে মাত্র ৫ বছর।' তিনি এও আশা প্রকাশ করেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

এদিকে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ব্রিটেনকে টপকে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এল। পঞ্চম স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেল ব্রিটেন। সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বহুগুণ বেড়েছে। এমতাবস্থায় ৫ থেকে ৬ নম্বরে নেমে যাওয়া ব্রিটেনের কাছে অবশ্যই বড়ো ধাক্কা স্বরূপ। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষ তিন মাসেই ব্রিটেনকে কিস্তিমাত দিয়েছে ভারত।

সম্প্রতি ডলারের তুলনায় টাকার দামের পতন, ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান নেমে যাওয়ার ঘটনাকে হাতিয়ার করে ভারতের অর্থনীতিকে যেভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে, বাস্তব চিত্রটা কিন্তু তেমন নয়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের মার্চ ত্রৈমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ৮৫৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে ব্রিটেনের অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ৮১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান ধারায় ভারতের অর্থনীতি উন্নয়নশীল হলে আগামী কয়েক বছরে ব্রিটেন ও ভারতের অর্থনীতিতে পার্থক্য আরও বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে ব্লুমবার্গ। প্রকাশিত প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতি বছরে ১৩.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পূর্বাভাস থেকে এ হিসাব কিছুটা কম। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হারে সর্বোচ্চ ছিল। এক দশক আগে ভারতের অবস্থান ছিল ১১তম স্থানে। সেখান নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ভারতের অবস্থান পঞ্চম স্থানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর মধ্যেই ব্লুমবার্গের নতুন প্রতিবেদন এই আশার আলো জ্বালাচ্ছে নিশ্চয়ই। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সম্প্রতি ডলারের তুলনায় টাকার দামের পতন, ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান নেমে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে হাতিয়ার করে ভারতের অর্থনীতিকে যেভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে, বাস্তব চিত্রটা কিন্তু তেমন নয়।

বস্তুত, দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পাহাড়প্রমাণ আর্থিক দুর্নীতি ইত্যাদি নানা কারণে টাকার দামের পতন হচ্ছে, ক্ষুধা সূচকেও দেশ নামছে। এ ব্যাপারে আগামীদিনে কেন্দ্র হাল ধরবে বলে আশা করাই যায়। □

মরু সংস্কৃতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকছেন ইরানের মহিলারা

রক্তিম দাশ

আমাদের দেশে যখন 'হিজাব আমাদের অধিকার' বলে চিৎকার করছেন মরুঃ সংস্কৃতির ঠেকা নেওয়া একদল মোল্লাবাদী, ঠিক তখনই প্রকাশ্যে হিজাব পুড়িয়ে মরু সংস্কৃতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকছেন ইরানের মহিলারা! আয়াতুল্লা আলি খোমেইনির মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা এখন ইরানের রাস্তায়। অথচ ইরানের মহিলাদের এই প্রতিবাদী মুখকে সমর্থন করতে দেখা যাচ্ছে না ভারতের তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের। যারা নাকি স্কুল-কলেজে হিজাব পরার অধিকারের বিরোধিতা করাকে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে চিল চিৎকার জুড়েছিলেন এই তো ক'দিন আগে।

ইরানের হিজাববিরোধী আন্দোলন নতুন কিছু নয়। বাধ্যতামূলক মাথা ঢাকার নিয়ম চালু করার পর থেকেই বিভিন্ন সময় ইরানি মহিলারা হিজাববিরোধী আন্দোলন করেছেন। ১৯৩৬ সালে রেজা শাহ পাহলভির শাসনকালে জনসমক্ষে মহিলাদের হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল (কশফ-এ-হিজাব)। তাঁর শাসনকালে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা মহিলারা ইসলামি গোঁড়ামি মুক্ত ইরানের প্রতীক ছিলেন। ইরানের শাসক শাহ মহম্মদ রেজা পাহলভিকে উৎখাত করার আগে তেহরানের রাস্তায় মিনিস্কার্ট ও খোলা মাথা কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য ছিল না। পাহলভির স্ত্রী ফারাহও পশ্চিমি পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন। খোমেইনির ইসলামি বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ সালের মার্চেই মহিলারা বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে তেহেরানের রাস্তায় নেমে পড়েন। কয়েকদিন ধরে সে আন্দোলন চলতে থাকে। সেই তেহরানের রাস্তায় হাজারো ইরানি মহিলা মাথা খোলা রেখে সমবেত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে যখন ইসলামিক রিপাবলিক হিজাবকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে, তখন হিজাব পরিহিতা মহিলাদের এক নতুন ইরানের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতীক করে তোলা হয়।

ইসলামি শরিয়তের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তৈরি করা আইনের অধীনে একজন মহিলাকে তাদের মাথা ঢেকে (হিজাব বা স্কার্ফ দিয়ে) রাখতে হয় এবং লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হয়। আর এই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় ইরানের নীতি পুলিশের ওপর। ২০০৫ সালে পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইরানে এই বাহিনীকে বলা হয় গাশত-ই এরশাদ। ইরানের নীতি পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ২২ বছর বয়সি মাহসা আমিনির মৃত্যুতে প্রতিবাদ শুরুঃ হয় রাজধানী তেহরান-সহ ইরানজুড়ে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর তেহেরানের নীতি পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করেছিল তখন আমিনির মাথার হিজাবের আড়ালে কিছু চুল দৃশ্যমান ছিল।

> আমরা সারাদিন আলোচনা করে মাহসা আমিনিকে শ্রদ্ধা জানাই। এরপর প্রতীকীভাবে হিজাব জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছি। আজকের আধুনিক যুগে এ ধরনের প্রথার কোনোও স্থান নেই। কোনও নারীকে হিজাব পরতে কেউ বাধ্য করতে পারবে না।

পরে তাঁকে আটক করে হাসপাতালে নেওয়া হলে ৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। অভিযোগ রয়েছে যে নীতি পুলিশ তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে, যদিও পুলিশ তা অস্বীকার করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নীতি পুলিশ বিবিসিকে বলেছেন, 'তারা (কর্তৃপক্ষ) আমাদের বলেছে, আমরা নীতি পুলিশ ইউনিটের জন্য কাজ করছি, আমরা নারীর সুরক্ষার জন্য কাজ করছি। যদি মহিলারা সঠিকভাবে পোশাক না পরে, তাহলে পুরুষরা উত্তেজিত হতে পারে এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে।' তার কথায়, তিনি যে দলে কাজ করতেন সেখানে ৬ জন ছিলেন। এর মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। যেসব জায়গায় ট্রাফিক রয়েছে এবং জনসমাগম বেশি হয়, সেসব জায়গায়ই তারা ফোকাস করতেন। তিনি আরও বলেছেন, 'এটি অদ্ভুত, কারণ আমরা যদি মানুষকে দিক নির্দেশনা দিতে চাই, তবে কেন ব্যস্ত জায়গা বাছাই করতে হবে? এর অর্থ এই যে, আমরা যাতে আরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারি। এ যেন আমরা শিকারে বের হচ্ছি। কোনো নীতিপুলিশ যদি

ফঃ ২

পোশাকবিধি লঙ্ঘনকারী পর্যাপ্ত মহিলাকে চিহ্নিত করতে না পারতেন, তবে কমান্ডার তাকে তিরস্কার করতেন যে তিনি সঠিকভাবে কাজ করছেন না। কমান্ডাররা আশা করেন যে আমরা মহিলাদের ভ্যানের ভেতরে জোর করে নিয়ে যাব। এটা করতে গিয়ে আমি কতবার কেঁদেছি জানেন?' যাদের তিনি আটক করেছেন তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি তাদের বলতে চাই, আমি তাদের একজন নই। আমাদের বেশিরভাগই সাধারণ সৈনিক, আমাদের বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়।'

এই ঘটনার পরই মরু সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ইসলামি শাসনতন্ত্রের নাগপাশ ছিঁড়তে রাস্তায় নেমেছে ইরানের মহিলারা। মহিলাদের সঙ্গে পুরুষরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এমনকী নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মারা যাওয়া সবাই পুরুষ। হাজার হাজার ইরানি পুরুষ সংহতি দেখিয়েছেন এবং এই আন্দোলন তেহেরান থেকে ইরানের আরও ৫০টি বড়ো ও ছোটো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইরানের রাস্তায় রাস্তায় বর্তমানে 'স্বৈরাচারীর মৃত্যু হোক' স্লোগান উঠছে। ইরানি মহিলাদের উপর ইসলামি নির্দেশের কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে প্রকাশ্যে তারা মাথার চুল কেটে ফেলছেন এবং হিজাব পুড়িয়ে দিচ্ছেন।

ইরান হিউম্যান রাইটস সংস্থার মতে, নাগরিক বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১২০০-রও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাসনযন্ত্র প্রাণঘাতী বল প্রয়োগেও পিছপা হয়নি। বিক্ষোভ চলাকালীন ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী ২০ বছর বয়সি হাদিস নাজাফির মুখে, গলায় ও বুকে ছ'বার গুলি চালায়। ইসলামের নামে ইরানের মহিলাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হলেও তাঁরা এটা মেনে নেননি। বরং হিংসা প্রয়োগ করে তাঁদের তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে সামাজিক জীবনে স্বাভাবিক ভাবে অংশগ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯০-এর দশকে মহিলা সমাজকর্মীরা পরিবার আইনের আওতায় তাঁদের থেকে কেড়ে নেওয়া অধিকারগুলির কয়েকটির পুনরার্জনে সচেষ্ট হন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সূচনা করার স্বাধীনতা-সহ নিজের হেফাজতে সন্তানের দায়িত্ব পেতে সফল হন। অসংখ্য মহিলা তাঁদের জীবনযাপনের করুণ অবস্থা তুলে ধরার জন্য বার বার নিয়ম ভেঙে দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হোমা দারাবি জনসমক্ষে তাঁর হিজাব খুলে ফেলেন এবং ইসলামিক বাধ্যতামূলক পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেকে আগুনে দগ্ধ করেন।

২০১৯ সালে শহর খোদায়ারি মহিলাদের উপর ইসলামিক বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতীক হয়ে ওঠে। একটি ফুটবল ম্যাচ দেখার চেষ্টা করার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে তিনি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিয়ো। তাতে দেখা যাচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীরা ইরানের রাস্তায় ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ইসলামিক ধর্মগুরুদের উপরে এবং তাদের মাথা থেকে পাগড়ি টান মেরে ফেলে দিচ্ছেন। তারপর কাউকে কাউকে ছুটে পালাতে দেখা গেলেও অনেকেই এমন ভাব করছেন যেন কিছুই করেননি। ইরানি স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা আয়াতুল্লা খোমেইনি-সহ ইসলামিক ধর্মগুরুদের ছবিও ছিঁড়ে ফেলছে। স্কুল ক্যাম্পাসের মাঠে জড়ো হয়ে হিজাব খুলে বিক্ষোভ করতে দেখা যাচ্ছে তাদের। এই প্রথম স্কুল পড়ুয়ারা এভাবে পথে নেমে বিক্ষোভ করছে।

ইরানের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই-কমিশনার নাদা আল-নাশিফ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'যারা হিজাব পরতে চায় না তাদের টার্গেট, হয়রানি ও আটক করা বন্ধ করতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব চাপিয়ে দেওয়ার মতো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রয়োগ থেকে বের হয়ে আসতে হবে ইরানকে। মাহসার মৃত্যুই কি ইরানে মোল্লাতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক? পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে হিজাব ইস্যুতে ইরানে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

এদিকে, ইরানের হিজাব বিরোধী আন্দোলনের আঁচ ভারতের তথাকথিত বাম সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের স্পর্শ না করলেও তা কিন্তু একটু একটু করে ছড়াচ্ছে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে। মরু সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পথে এগোচ্ছেন তাঁরা। ইসলামি শরিয়তের নামে দীর্ঘদিন ধরে দেশে চলে আসা জঘন্য তিন তালাক প্রথা নরেন্দ্র মোদী সরকার তুলে দেওয়ার পর সাহসী হয়েছেন তাঁরা। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল সম্প্রতি কেরলের কোঝিকোড়ে। ইরানের মহিলাদের সমর্থনে হিজাব পোড়ালেন একদল মুসলমান মহিলা। হিজাব পোড়ানোর এই অনুষ্ঠানের আয়োজক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এম ফৌসিয়া বলেন, 'আমরা সারাদিন আলোচনা করে মাহসা আমিনিকে শ্রদ্ধা জানাই। এরপর প্রতীকীভাবে হিজাব জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছি। আজকের আধুনিক যুগে এ ধরনের প্রথার কোনোও স্থান নেই। কোনও নারীকে হিজাব পরতে কেউ বাধ্য করতে পারবে না।' কোঝিকোড়ের এই মহিলাদের বক্তব্য দেশের বাম-সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা কী শুনতে পাচ্ছেন? □

With Best Compliments from-

A Well Wisher

ধর্মান্তরণের পর দলিত হিসেবে সংরক্ষণের দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়

রঞ্জন কুমার দে

জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় উপমহাদেশে ক্যান্সারস্বরূপ। এটা একদিকে সমাজের একাত্মতাকে যেমন ধ্বংস করছে ঠিক তেমনি ভ্রাতৃত্বের মধ্যে কৃত্রিম দেওয়ালের আবরণ তৈরি করছে। ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যা, বুদ্ধিজীবীদের উদাসীনতা, সমাজের তৃণমূল স্তরে সরকারি জাগরণের অভাব, রাজনৈতিক লাভালাভ, প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিকতার অভাব প্রভৃতি হলো জাতিভেদ প্রথা সমাজে মাথাচাড়া দেওয়ার মুখ্য কারণ। জাতিভেদ প্রথার কারণে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষকে কয়েক শতাব্দী থেকে যে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এবং সেটা আজকের দিনেও উত্তর ভারত, মধ্য ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করে আছে। জাতিভেদ প্রথার জন্যই হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়ে খ্রিস্টান মিশনারি ও আরবীয় সংস্কৃতির মোল্লা মৌলবীদের ছায়ায় আশ্রিত হয়েছে বা বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ'। অর্থাৎ চারটি বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে গুণ ও কর্মের বৃত্তিতে। কর্মানুযায়ী যারা শাস্ত্র রচনা করবে তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁর পিতা বৈশ্য হলেও সে ব্রাহ্মণ। অস্ত্র চালনা করলে তাঁরা ক্ষত্রিয়, তাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ হলেও তাঁহারা ক্ষত্রিয়।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শাস্ত্রে জাতপাত বিভাজনের কোনো স্থান নেই। প্রমাণস্বরূপ মহাভারতে কৃষ্ণের কোনো পদবি নেই, অর্জুনেরও নেই। পুরুষোত্তম ভগবান রামেরও কোনো পদবি নেই। নমঃশূদ্র জাতির গোত্র যেমন কাশ্যপ, চট্টোপাধ্যায়দের গোত্রও কাশ্যপ। স্বামীজী এবং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর হেডগেওয়ারজীর গোত্রও কাশ্যপ। অর্থাৎ এঁরা সবাই কশ্যপ ঋষির সন্তান। এমনিভাবে আমরা হিন্দু সবাই কোনো না কোনো ঋষির বংশধর। তাই আমাদের অমৃতপুত্র বা ঋষিসন্তানও বলা হয়। সমালোচকরা সর্বদা হিন্দু সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরূপে আখ্যায়িত করে থাকেন কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদের রচয়িতা ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পৈতা ধারণে গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ নন, দেবতারা যে দধীচি

দলিত মুসলমান কিংবা খ্রিস্টানদের কোনো উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়ন হতে শোনা যায়নি। তাহলে কেন পিছিয়ে পড়া মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য ওবিসি কোটাতে সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন যুক্তিতে তারা আবার তপশিলি জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করছে?

মুনির আত্মত্যাগে স্বর্গ পুনরুদ্ধার করেন তিনিও শূদ্র ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের উদ্ধারকর্তা অগস্ত্য মুনিও শূদ্র ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি মুনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। উত্তরপ্রদেশে আজও তাঁদের ঘোর দলিত হিসেবে মানা হয়। এরকম অগণিত উদাহরণ আছে যার দলিলস্বরূপ কখনো হিন্দু সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরূপে আখ্যায়িত করা যায় না। শৈব শ্রী শংকরাচার্য জাতপাত ভেদাভেদ সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখে গেছেন—

'ন যে মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতি ভেদঃ (নির্বাণ-ষট্‌কম : ৫)।

অর্থাৎ 'আমার কোনো মৃত্যু নেই, শঙ্কা নেই এবং কোনো প্রকার জাতিভেদ নেই।'

ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ অনেক আগেই মন্তব্য করে গেছেন, 'হিন্দু কখনো হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য হইতে পারে না। হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন ও ঐক্যের মধ্যে দিয়াই হিন্দু জাতি অসীম শক্তির অধিকারী হইবে।'

প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে দলিত শব্দটির কোনো জায়গাই নেই। রামায়ণে শ্রীরাম শবরীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছেন, বাল্যসখা নিষাদ রাজা গুহক ও রামচন্দ্রের আত্মার আত্মীয় দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তবে জাতপাতের ঘৃণ্য মানসিকতার উপরে উঠে আমরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি এবং হিন্দু সমাজকে এক ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড় করিয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ, ২০১৪ সালে বিহারের তৎকালীন দলিত মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝি একটি মন্দির দর্শন করার পরে পুরো মন্দির ধুয়ে পবিত্র করা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের কোলার জেলায় ১৫ বছরের এক দলিত পরিবারের ছেলেকে শুধুমাত্র মন্দিরের বিগ্রহ স্পর্শ করার অপবাদে গোটা পরিবারটিকে ৬০ হাজার টাকার জরিমানা করা হয় নতুবা গ্রাম ছেড়ে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এমন অবস্থায় সহায় সম্বলহীন অসহায় মা শোভাম্মা আম্বেদকরের ছবি টাঙিয়ে পুজো করবেন বলে স্থির করেছেন। গত ৫ অক্টোবর রাজস্থানের বারাং জেলায় মা দুর্গার আরতি করায় দুই দলিত যুবককে মারধর করা হয়। অবশেষে ওই গ্রামের ২৫০ লোকের দলিত পরিবার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। এরকম বিবেকহীন ঘটনা দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে প্রায় প্রতিদিনই ঘটেই চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'কোনো লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে, তাহা নয়; একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত প্রত্যেকটি বৌদ্ধিকে বলছেন বর্ণবাদ বা জাতিবাদের মতো প্রথা ভারতীয় সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। এমন কোনো প্রথা থাকা উচিত নয় যেটি সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে। দলিত শব্দটিকে সংবিধানে উপস্থাপনা করা হয়েছে তপশিলি জাতি-উপজাতি হিসেবে। খোদ বাবাসাহেব আম্বেদকর স্বীকার করেছেন ব্রিটিশদের সৌজন্যেই আমাদের সমাজে দলিত অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তৎকালীন ব্রিটিশদের জনগণনায় নিষ্পেষিত হিন্দু সমাজকে প্রথম দলিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৫০ সালে ৩৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সমাজের অস্পৃশ্য, বহিষ্কৃত হিন্দুদের অনুসূচিত জাতি তথা দলিত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর শিখদের দাবি অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপতির আরেকটি নির্দেশে অস্পৃশ্য ও বঞ্চিত তালিকায় দলিত হিসেবে শিখদেরও যুক্ত করা হয়। সবশেষে ১৯৯০ সালে কেন্দ্রের ভিপি সিংহ সরকারের আমলে নববৌদ্ধ সম্প্রদায়কেও অনুসূচিত জাতিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে অন্য নির্দেশিকাতে পরিষ্কার বলা হয়, হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অনুসূচিত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ বিশেষত মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জাতিভেদ প্রথা না থাকায় সেখানে সামাজিক ভেদাভেদেরও কথা আসছে না, অর্থাৎ কোনো দলিত এই দুই সম্প্রদায়ে ধর্মান্তরিত হলে আইনগত ভাবে অনুসূচিত জাতির অনুমোদন পাচ্ছে না। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত অনেক মুসলমান ও খ্রিস্টান সংগঠন সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র আয়োগের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে শিখ ও বৌদ্ধদের মতো ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রিস্টানদেরও অনুসূচিত জাতিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি করে আসছে। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে রঙ্গনাথ মিশ্রের সুপারিশ সম্বন্ধে নিজেদের অবস্থান জানতে চাইলে সরকার স্পষ্ট জবাব দেয় যে মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে কোনো জাতিভেদ প্রথা নেই, তাই তাদের কোনো ভাবেই অনুসূচিত জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই আসে না।

একাধিক আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট আবার কেন্দ্র সরকারকে চলতি বছরের ১১ অক্টোবর একই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে জানতে চায়, কিন্তু কেন্দ্র সরকার এর আগেই পূর্বতন চিফ জাস্টিস কে.জি. বালাকৃষ্ণনের অধ্যক্ষতায় তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। যেটি আগামী দু' বছরের মধ্যে সরকারকে রিপোর্ট করবে ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে কী সত্যিই অনুসূচিত জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না! কিন্তু বিরোধীরা অভিযোগ করছে সুপ্রিম কোর্টকে প্রভাবিত করে রায় বিলম্বিত করার এটা সরকারের একটা চক্রান্ত। তবে দলিত ও জনজাতি সংগঠনের বক্তব্য হচ্ছে, খ্রিস্টান, মুসলমান সম্প্রদায় সর্বদা নিজেদের জাতিভেদমুক্ত দাবি করে আসছে এবং এটাক সর্বজনীন করে তারা হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিতও করছে।

কোনোদিন এমনও শোনা যায়নি যে দলিত মুসলমান কিংবা খ্রিস্টানদের কোনো উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়ন হতে। তাহলে কেন পিছিয়ে পড়া মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য ওবিসি কোটাতে সংরক্ষণের বিধানও রাখা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন যুক্তিতে তারা আবার তপশিলি জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করছে এবং কেন্দ্র সরকারকে চাপ দিচ্ছে? এমনটি কার্যকর হলে দেশের খ্রিস্টান মিশনারি এবং জেহাদি সংগঠনদের ধর্মান্তরকরণের দাপট আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। এমন অবস্থায় সরকার এবং সর্বোচ্চ আদালতের উচিত দেশের সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তপশিলি জাতিতে অন্তর্ভুক্ত না করা। □

বিশ্বনাথ মন্দিরের আমূল সংস্কার হিন্দুদের বহুদিনের স্বপ্নপূরণ

আনন্দ মোহন দাস

ভারতবর্ষে ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে যা হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। হিন্দুদের কাছে জাগ্রত শিবের মন্দির হলো কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির। এই মন্দিরের অনেক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বিদেশি আক্রমণকারীদের শিকার হয়ে কয়েকবার লুণ্ঠিত হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও নাকি বেঁচে থাকবে কাশী। শহরটি গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। কাশীকে মোক্ষ নগরীও বলা হয়। জীবনের যাবতীয় কর্তব্য পালন করে মোক্ষ লাভের জন্য কাশীতে আসেন বহু মানুষ। জীবন সায়াহ্নে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে অনেকেই কাশীবাসী হতে চান অনেকে। সেজন্য মন্দির নগরী কাশীকে 'বার্ধক্যের বারাণসী' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। কাশীই আজকের বারাণসী নামে পরিচিত। আরও বলা যায় বারাণসী শহর হলো ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। পবিত্র মন্দির ছাড়াও এখানে খ্যাতিসম্পন্ন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং গঙ্গা তীরবর্তী মনোরম সুন্দর ঘাটগুলি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি শহরের একটি বহু প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে।

সেইজন্য সকলেই কাশী দর্শনের অপেক্ষায় থাকেন। বলা বাহুল্য কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন ও বারাণসী ভ্রমণের জন্য দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী ও ভক্তদের সমাগম হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনায় বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরের আমূল পরিবর্তন হওয়ায় এবং শহরের সৌন্দর্যায়নের পর এই স্থানের আকর্ষণ তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিও বহুদিন ধরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ভব্য রূপ দর্শন করার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম। সেই উদ্দেশ্যে

বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় গত ২২ অক্টোবর দীপাবলীর সময় বারাণসী পৌঁছে গেলাম। আগের বারাণসী শহরের সঙ্গে বর্তমান বারাণসীর কায়াকল্পের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। শহরের রাস্তাগুলি অনেক চওড়া ও সুন্দর হয়েছে। মন্দির চত্বরে দোকান, বাড়ি ও ব্যবসা কেন্দ্রের দেওয়ালগুলি একই রঙে (হালকা গেরুয়া) রঙিন করা হয়েছে। দোকান বা অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রের সাইনবোর্ডগুলিও একই ধাঁচের ও রঙে রাঙানো রয়েছে। বহু বাধা অতিক্রম করে রাস্তাগুলি অনেক প্রশস্ত হওয়ার পরেও তীর্থযাত্রী ও ভক্তদের জনস্রোতে দেওয়ালীতে রাস্তাগুলি যেন ছোটো মনে হচ্ছিল। বিখ্যাত গোদোলিয়ার চৌরাস্তার মোড় দেখলাম অনেক চওড়া হয়েছে। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড়ে যেন এ এক মিনি ভারতবর্ষ। এই তীর্থস্থানগুলি ভারতের অন্তরাত্মা ও একাত্মতার প্রতীক। পরদিন বহু প্রতীক্ষিত বাবা বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন। সমস্ত কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মন্দির দর্শন ও শিবের মাথায় জল নিবেদনের উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে রওনা দিলাম। ভোর চারটায় মন্দির খুলে যায়।

সেই মতো সপরিবারে খুব সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে বিশ্বনাথ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিলাম। গঙ্গার ঘাটে বেশ ভিড়। যদিও প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় ললিতাঘাট থেকে স্নান সেরে সোজা মন্দিরে প্রবেশ করা যায় কিন্তু দীপাবলীর প্রচণ্ড ভিড় এবং গঙ্গায় জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসন সোজা মন্দির প্রবেশের ললিতা ঘাটটি সাময়িক বন্ধ রেখেছিল। মন্দিরে প্রবেশের জন্য সর্বমোট চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। সেইভাবে দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশের একটি গেট দিয়ে গলির মধ্যে একটি দোকানে পূজার সামগ্রী কিনে ক্রমশ মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। গলিপথগুলির পরিসর কিছুটা বেড়েছে এবং পথে পাথর বসানো হয়েছে। দু'পাশে বেশিরভাগ পূজা সামগ্রীর দোকান রয়েছে। কিছুক্ষণ পর মন্দির দর্শন ও পূজার জন্য প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে গেলাম। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তারক্ষীদের আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। কয়েকটি স্থানে সুরক্ষা কর্মী দ্বারা পরীক্ষার পর মন্দিরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

মন্দিরের ঘণ্টার ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। খানিকটা দূরে দৃশ্যমান মা অন্নপূর্ণার মন্দির। সকলেই গঙ্গাস্নান সেরে স্নিগ্ধ চিত্তে দলে দলে তাদের আরাধ্য দেবতার দর্শনে এগিয়ে চলেছে। খুব সকালেও লম্বা লাইন থাকায় কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মন্দিরে বাবা

বিশ্বনাথের মাথায় জল নিবেদন করে মনস্কামনা পূর্ণ করলাম। প্রথম দর্শনেই মন্দির পরিসরের বিশালতা ও সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হতে হয়। মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত করিডোর নির্মাণের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করলাম। বহু বছর আগে ছোট্ট পরিসরে মন্দির দর্শন করেছিলাম। বর্তমানে মূল মন্দিরের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। জানা গেল দক্ষিণ ভারতের এক ব্যবসায়ী মন্দির সোনার চাদরে মুড়ে দেবার জন্য ৬০ কেজি সোনা দিয়েছেন। সেইমতো বিশ্বনাথের মূল মন্দির সোনার চাদরে মোড়া। মন্দিরে পূজা দেবার পর অপূর্ব মন্দির চত্বরটি ঘুরে দেখলাম। মনে হলো তুলনায় পাশে বিতর্কিত মসজিদটি যেন ম্রিয়মাণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিশাল জায়গা জুড়ে সমস্ত মন্দির চত্বর গ্রানাইট পাথর দিয়ে বাঁধানো। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জুতা রাখার জন্য আলাদা ব্যবস্থা।

মন্দিরের ভব্য রূপ দেবার জন্য এবং পরিসর বৃদ্ধির জন্য গত ২০১৯-এ মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকল্পটির শিলান্যাস করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে মন্দির সংস্কারে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে যোগী আদিত্যনাথের সরকার যে অসাধ্য সাধন করেছে তা এককথায় অসাধারণ। জনবহুল এলাকায় সরকার নীরবে যে কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছে তা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমেই বলি মন্দির চত্বরের পরিসর ২৭০০ বর্গফুট থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত করিডোরটি ৫০ ফুট চওড়া হয়েছে। অর্থাৎ গঙ্গাস্নান সেরে সোজা মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করতে অপূর্ব লাগছিল। মন্দির পরিসরের সম্পূর্ণ সংস্কার করতে প্রায় চার বছর সময় লেগেছে। মন্দিরের চারটি প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ থাকলেও দক্ষতার সঙ্গে করোনার মধ্যে প্রায় ১৪০০ আবাসন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে সরকার। মোট ১১১১ জন লোককে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। বাড়ি, দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সব মিলিয়ে প্রায় ৩২০টি বিল্ডিং ভাঙা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারের খরচ হয়েছে ৩৯০ কোটি টাকা এবং পুনর্বাসনের জন্য ১০০ কোটি টাকা। সদিচ্ছা থাকলে যে সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায় তা এই বিশাল প্রকল্পটির রূপায়ণ দেখলে অনুভব করা যায়। অবশ্যই যোগী সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশংসা না করে পারছি না।

এই পরিকল্পনায় গঙ্গার ঘাটগুলিও সংস্কার করে চওড়া করা হয়েছে। যেমন অসিঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, ললিতা ঘাট, মণিকর্নিকা ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট প্রভৃতি। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে দশাশ্বমেধ ভবন নামে ভক্তদের জন্য একটি বিরাট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মনে হলো এটির সরকারি ভাবে এখনও উদ্বোধন হয়নি। চালু হলে তীর্থযাত্রীদের জন্য এটি একটি সুন্দর পরিষেবা। গঙ্গার তীরবর্তী ঘাটগুলির মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের জন্য দুটি প্রসিদ্ধ ঘাট রয়েছে। একটি হলো রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাট এবং দ্বিতীয়টি হলো মণিকর্ণিকা ঘাট।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্ধ্যারতি একটি অত্যন্ত দর্শনীয় বিষয়। এই আরতি দেখার জন্য অনেক দূর থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হয়। বিদেশি পর্যটকদের আরতি দেখার ভিড় দেখলাম। গঙ্গাঘাটের ঠিক ডান পাশে গঙ্গামাতার মন্দির এবং এখানে সন্ধ্যায় পূজা শেষে পাশে একটি ছাদের বিরাট চত্বরে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন। গঙ্গার ঘাটে নৌকা বেঁধে মাঝিরা ১০০ টাকার বিনিময়ে নৌকায় বসে সন্ধ্যারতি দেখার ব্যবস্থা করেছে। আমরাও একটি নৌকায় উঠে বসলাম। গঙ্গায় প্রচণ্ড জলস্রোত। জলস্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য নৌকাটি বেশ দুলছে। মাঝগঙ্গায় দেখলাম কয়েকটি বড়ো সুসজ্জিত লঞ্চ ও স্টিমার ঘুরে ঘুরে গঙ্গাবক্ষ থেকে আরতি দর্শনের ব্যবস্থা করেছে। তাদের গতির জন্য ঢেউয়ের পরিমাণ খুব বেশি। নৌকায় আমাদের এক পাশে বসে রয়েছে কল্যাণীর একটি পরিবার। অন্যদিকে বসে রয়েছে আটজনের একটি ইতালীয় মহিলা পর্যটকদের দল। আরতি আরম্ভের আধঘণ্টা আগে পৌঁছে যাওয়ায় এই দলটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। তারাও কাশীতে সনাতন হিন্দুসমাজের সান্ধ্য গঙ্গা আরতি চাক্ষুষ করতে হাজির হয়েছেন। এখান থেকে তাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন। তাদের কথায় অনুভব করলাম তারা সকলেই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত। বিশ্ব জুড়ে হিন্দু দর্শনের প্রতি অনেকেই যে আকৃষ্ট হচ্ছে এটাই তার প্রমাণ। ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আরতি শুরু হলো। সাতজন পণ্ডিত গঙ্গা আরতি করছেন। অপূর্ব দৃশ্য। মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রীদের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে। বিদেশিনীরাও দেখলাম জয়ধ্বনিতে অংশ নিতে চেষ্টা করছে। আরতির মাঝে মাঝে মাইকে গঙ্গা সম্পর্কিত কিছু সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে এক মনোরম পরিবেশ। এক কথায় অসাধারণ বলা যায়। আধঘণ্টার আরতি ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় শেষ হলো। আরতি দেখে সকলেই মুগ্ধ এবং এদিনের সন্ধ্যা আরতি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকল। এবার বারাণসী ভ্রমণে একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, মন্দির ও মন্দির নগরীর সংস্কারের পর দেশি বিদেশি পর্যটক ও ভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্থানীয় ছোটো ব্যবসায়ী, দোকানদার, হোটেল, অটোওয়ালা, রিকশাওয়ালা, ট্যাকসিওয়ালা ও নৌকার মাঝিদের দৈনিক আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দু' বছর করোনায় বন্ধ থাকার পর অধিক সংখ্যায় তীর্থযাত্রী ও পর্যটক পেয়ে এদের মুখে হাসি ফুটেছে। সর্বোপরি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক রোজগার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে লক্ষ্য করলাম পর্যটন শিল্পে যোগী সরকারের নাকি অনেক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখানে তা দৃশ্যত বোঝা যায়। বামপন্থী বন্ধুদের সমালোচনায় থাকে মন্দির নির্মাণে বা মন্দির সংস্কারে সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া সাধারণ মানুষের নাকি কোনো উপকারে লাগে না। কিন্তু এই অপপ্রচার যে সর্বৈব মিথ্যা তা এই তীর্থস্থানে ভ্রমণ করলে বোঝা যায়।

সর্বশেষে বলা যায় হিন্দু মন্দিরের সংস্কারে পূর্বতন কোনো সরকারই সেভাবে নজর দেয়নি এবং হিন্দু তীর্থস্থানের উন্নয়নের প্রতি কখনো সদয় হয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার হিন্দু মন্দির ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের প্রতি সবিশেষ নজর দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ছাড়াও কেদারনাথ মন্দিরের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দিরময় ভারতবর্ষের বিখ্যাত মন্দিরগুলিকে এক দর্শনীয় স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেজন্য হিন্দু সমাজের কাছে নরেন্দ্র মোদী চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। □

প্রান্তিক মানুষও হতে পারেন ক্ষুদ্রশিল্পপতি কিংবা ছোটো ব্যবসায়ী

শেখর সেনগুপ্ত

জীবনের শূন্যস্থানটিকে ভরাট করতে মানব-মানবী সংসার পাতেন। কিন্তু সংসার পাতবার আগে কতগুলি শর্ত পালন প্রায় অনস্বীকার্য। শর্তগুলির একটিও অবান্তর নয় অথবা অন্তরীক্ষে থাকে না। বিষয়টা ঘোরতর বাস্তব। সবচেয়ে বড়োসড়ো শর্ত হলো, তোমাকে উপার্জনশীল হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কুশীলব যদি বাঙ্গালি হয়, সে প্রথমেই খুঁজবে— কোথাও চাকরি-টাকরি মেলে কিনা। অন্যভাবে বুদ্ধি-মেধা- শ্রমের বিনিয়োগে স্বাবলম্বী হওয়াটা অন্যায় বা বিধিবিরুদ্ধ না হলেও বঙ্গতরুণের দল অদ্যপি চাকুরি জোটাতেই নিজেদের বদ্ধপরিকর রাখেন। পরাধীন ভারতে যা ছিল স্বাভাবিক, এখনও এই বঙ্গে তাতেই সর্বাধিক প্রাধান্য। কিন্তু চাকরিটা কোথায়? সেটা যে এই আমলে কেবল আরও ক্ষীণ নয়, দুর্নীতির কালিমায় আরও দুর্লভ। ভয়ংকর ভ্রষ্টাচার। রাজনীতি আর নীতির রাজা নয়। ক্ষমতার তখ্‌তে বসে এই সরকার সেই শব্দের তাবৎ গৌরবকে বিনষ্ট করে ছেড়েছে।

চাকরি জোটাতে গেলে আপনাকে অনেক কুকর্মের জাদুকর হতেই হবে। আধিকারিকের পদলাভ তো দূরের কথা, একজন পিয়নের চাকরি জোটাতে গেলে কত যে কুকম্ম করতে হবে ক্ষমতাবানদের হয়ে, তা আর কহতব্য নয়। দুর্নীতির শিখরে আসীন লোকেরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে আছেন। যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা চাকরি পাচ্ছেন না। তীব্র প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবার পরও ক'জন যে হাতে নিয়োগপত্র পেয়ে থাকেন, সেই বিষয়ে রয়েছে ঘোরতর অনিশ্চয়তা। দুর্নীতির এহেন ব্যাপকতা বঙ্গবাসী ইতিপূর্বে কোনওদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন কি? তাহলে যারা রাজনীতির ডালপালা নন, সেই সকল তরুণ-তরুণীর কী হবে? এর উত্তর একটা আছে। নিজের ওপর আস্থাকে দৃঢ়তর করুন। বেশি ধোপদুরস্ত হবার দরকার নেই। সাজগোছের পরোয়া কম রাখুন। শরীর থেকে চমৎকার খুশবু না বের হয়েও চলবে। কেবল মাথা ঘামান; —সততা এবং নিজের ওপর আস্থা অটুট রেখে আপনি কী উপায়ে একজন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন। আপনি যে হতে পারেন একজন ক্ষুদ্রশিল্পপতি কিংবা একজন ছোটো ব্যবসায়ী— এই সম্ভাবনা তো ভারতব্যাপী সর্বত্রই অটুট।

হাতে-কলমে না হলেও একজন ব্যাংক আধিকারিক রূপে এক সময় আমি এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি, সাহায্যও করেছি। এখনও স্মৃতিতে সেসব অটুট। এই অবসরপ্রাপ্ত পরিণত বয়সে আমার হেপাজতে রয়েছে যে হরেক কিসিমের বই, তাদের মধ্যে একটির নাম 'ব্যবসায়ী'। রচয়িতা বিংশশতাব্দীর মধ্যপর্বের স্বনামধন্য বাঙ্গালি ব্যবসায়ী মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। মহেশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শৈলেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিল আমার বিশেষ হৃদ্যতা। ডাঃ ভট্টাচার্যই আমাকে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিরচিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি উপহার দেন। গ্রন্থটিতে রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি পত্র। তিনি লিখেছেন, 'মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আপনার লেখা 'ব্যবসায়ী' বইটি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। আপন অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে শুরু

রাজর্ষি নাগ, পরমার্থ সাহা, রাজর্ষি বসু, রণিত রায় ও প্রচেষ্টা মিত্র— পাঁচ বন্ধু ছাত্রাবস্থাতেই 'ড্রাইভার্স ফর মি' অ্যাপ তৈরি করে ব্যবসা শুরু করেন। আজ তাদের বার্ষিক টার্ন ওভার ২ কোটি ৮০ লক্ষ।

করিয়া আপনি এইরূপ উন্নতি করিয়াছেন। যে বাঙ্গলায় তরুণরা চাকুরির জন্য হাড়িকাঠে মাথা দিতে রাজি আছে, সেই বিস্তৃর্ণ দাস্যভাবের বিরুদ্ধে আপনি যেন এক মূর্ত প্রতিবাদ। নিজে হাতে-কলমে কাজ করিয়া, তৎসহ ঠেকিয়া ও ভুলিয়া যে অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করিয়াছেন, তাহার স্বাদ মিষ্টি, কষা নহে। বঙ্গীয় যুবগণকে স্বাবলম্বী হইবার স্বরলিপি হইয়াছে এই গ্রন্থখানি।'

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের যে বই নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অতখানি উচ্ছ্বসিত, তার একটি স্থানে গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, ''কেহ যদি ভাবিয়া থাকে যে ব্যবসা শুরু করিয়াই অনতিবিলম্বে আমি কুবের হইব, তাঁহার বিপদে পতিত হইবার সম্ভবনা প্রবল। ব্যবসায়ীরা জাদুকর নহেন। উচ্চাশার তাগিদে আমাকে উচ্চলম্ফনে ব্রতী হইলে চলিবে না। বাণিজ্য কিংবা শিল্প, যাহাই শুরু করুন না কেন, প্রথম অবস্থায় উহাকে ক্ষুদ্রভাবেই রাখিতে হয়। কাণ্ডারি আগে ক্ষুদ্র ডিঙ্গা চালাইতে পারিবে। যে যে ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাতে প্রবেশের পূর্বে ওই ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ হওয়াটা আবশ্যক। যদি নকশায় গলদ থাকে, প্রার্থিত প্রতিষ্ঠা অর্জনের সম্ভাবনা খুবই কম।" বাণিজ্যসফল, বড়ো মাপের মানুষ মহেশ ভট্টাচার্যের চর্চা চালিয়ে আমি এমন দুটো দিশা পাচ্ছি, যাদের গুরুত্ব অদ্যপি অনস্বীকার্য। প্রথম শর্ত, ব্যবসা অথবা শিল্পস্থাপন ছোটোভাবেই শুরু করতে হয়।

দ্বিতীয় শর্ত, যা নিয়ে ব্যবসা বা শিল্পস্থাপনে আপনি উদ্যোগী, সেই কর্মে আপনার পূর্বেকার অভিজ্ঞতা থাকাটা অত্যাবশ্যক। অনিশ্চয়তা ও অনভিজ্ঞতার বালুচরে দাঁড়িয়ে সাফল্যের ইমরত গড়তে থাকেন না। আবার সকল বাণিজ্য ও শিল্পস্থাপনের ক্রেতা একরকম হয় না। যাঁরা একেবারে প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের মুখ থেকে যদি তাবৎ বিবরণ শ্রবণ করেন, আপনার মনে হতে পারে, এই মানুষটিই নির্ভেজাল সিদ্ধপুরুষ। বলাবাহুল্য, যুগপৎ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে প্রায় সর্বক্ষণ। পরিবেশ-পরিচিতি নিয়ে চর্চাও করতে হয়েছে প্রতিক্ষণে এবং প্রায়শ নীরবে। নিশানাটা ছিল সর্বক্ষণ একমুখী— আত্মপ্রত্যয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সময়জ্ঞান। যেহেতু ব্যবসার ধরনধারণে বিভিন্নতা থাকতে পারে, আপনাকে তাই শুরু করবার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে সফল ব্যক্তির পরামর্শের সন্ধানে থাকতেই হবে। ব্যবসা বা শিল্পে সূচনাতেই চটজলদি লাভের অঙ্গ চমকপ্রদ সচরাচর হয় না। আবার মুনাফার ধারা সর্বদাই যে ঊর্ধ্বমুখী হবে, এমনটি ভাববেন না। আর সততা বজায় রাখুন। সরকারের প্রাপ্য মেটাতে গিয়ে অসাধুতার আশ্রয় নেবেন না। মানুষ হিসেবে থাকুন স্পষ্টবাদী, সামাজিক এবং স্পষ্টত বিনয়ী। এগুলি মোটামুটি মানসিক গঠনের কথা। এবার নজর দেওয়া উচিত কয়েকটি নিরেট বিষয়ের দিকে :

মূলধন :

সাত বছর বয়সের শিশুও জানে, মূলধন ছাড়া ব্যবসা বা শিল্পস্থাপন বাস্তবায়িত হতেই পারে না। উদ্যোক্তার নিজের কাছে যদি প্রয়োজনীয় রেস্ত থাকে, তিনিও অনেকটা নির্ভয়ে স্বপ্নপূরণে ব্রতী হতে পারেন। পরে প্রয়োজন মেটাতে আরও মূলধনপ্রাপ্তির উপায়গুলিকে নিজের নাগালে নিয়ে আসতে পারবেন। আমি আমার কর্মজীবনে এরকম উদ্যোগপতি কিছু দেখেছি, যাঁরা অত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন ব্যবসা অথবা ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করবার লগ্নে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্যম, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা যদি যথাযথ হয়, ব্যবসা শুরু করতে অথবা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে ঋণরূপী আর্থিক সহায়তা মিলতে পারে দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। প্রথমটি হলো রাজ্য/কেন্দ্রীয় আর্থিক নিগম (State/ Central Financial Corporation); দ্বিতীয়টি কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি ব্যাংক। উদ্যোগীর আবেদনপত্রটিতে যদি প্রয়োজনীয় শর্তাদির প্রতি মান্যতা থাকে এবং বাজারে তাঁর দুর্নাম না থাকে, তিনি ঋণ পেতেই পারেন। দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক রূপে ইত্যাকার অনেক অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চয়ে রয়েছে। এছাড়া আবেদনকারী যদি তপশিলি কিংবা জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হন, ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহে তাঁর পথ অনেকটাই সুগম হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণনীতির দৌলতে। এহেন সুবিধা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্যোমীরাও পেয়ে থাকেন। সংখ্যালঘু বিত্তনিগমের ঔদার্যের বিস্তর নিদর্শন রয়ে গিয়েছে এই রাজ্যে এবং অন্যত্রও।

কিন্তু মূলধনের জন্য আবেদন রাখবার আগে আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে একটি সুগ্রন্থিত স্কিম— যা বাণিজ্য বা শিল্প দু-ই হতে পারে। সেখানে আপনাকে দেখাতে হবে প্রারম্ভিক সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ, বাজারের অবস্থিতি তথা পরিধি, সম্ভাব্য ব্যয় চুকিয়ে মুনাফার পরিমাণ কত হতে পারে, ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীণ ব্যাপ্তি কতটা, লভ্য হবার সম্ভাবনা ইত্যাদি সাত-সতেরো।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যাঁরা ক্ষমতায় আসীন, তাঁরা উদ্যোগপতি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সক্রিয় নন। যেন তেন প্রকারণে ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা ভিক্ষায় ও সারশূন্য ফুর্তিতে অভ্যস্ত রাখতে চান ভোটারদের। নবীন প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করবার ন্যূনতম প্রয়াস এঁদের নেই। কিছু ক্লাবকে ফুর্তি ও উৎসাহের টাকা দেওয়া, 'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে ভিক্ষার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন বেকারত্ব কমবে না, তেমনি উদ্যোমীরাও পাবেন না কোনও যথাযথ প্রকল্পের সন্ধান বা সহায়তা। প্রান্তিক মানুষ প্রান্তেই থাকবেন। স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা ও বাসনাও ক্ষীণ হচ্ছে দিন দিন, বিশাল বিশাল দুর্নীতির ছোবলে দিশেহারা নবীন সমাজ।

□

আন্তরিকতা ও অনুভূতির অবক্ষয়

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব মানুষ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে আজকের আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে। মানুষ একদিন বাঁচার প্রয়োজনে ও হিংস্র পশুর আক্রমণ ঠেকাতে জোটবদ্ধ ভাবে বসবাস শুরু করেছিল। ক্রমে আদিম প্রবৃত্তি ছেড়ে একটু একটু করে সভ্য সমাজের মানুষের মানবিক গুণগুলি অর্জন করেছিল। হিংস্র প্রবৃত্তি ত্যাগ করে দয়া, মায়া, সততা, আন্তরিকতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়। তাদের মধ্যে অনুভূতির জন্ম নেয়, তাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সমানুভূতি ছিল অফুরন্ত। আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগেও মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা ও অনুভূতির অভাব ছিল না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি তার আন্তরিকতা ছিল। অন্তর থেকে একটা অনুভূতি প্রকাশ পেত। তখন মানুষ কেউ কারও বাড়ি গেলে তার সঙ্গে বাড়ির সবাই কুশল বিনিময় করতো ও ভালোমন্দের খোঁজ খবর নেওয়া হতো। অতিথি আপ্যায়নের জন্য সবাই ব্যস্ত হতো।

অন্তরের ভালোবাসা শ্রদ্ধা, ভক্তির মধ্যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। অতিথিকে থাকার জন্য অনুরোধ করা হতো। তিনি থাকলে পরিবারে খুশির পরিবেশ থাকতো। তখন মানুষের হাতে সময় ছিল। তাই তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন থাকতে পারতেন। কিন্তু আজ মানুষ সীমাহীন চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন ও স্বার্থের জন্য তিনি আত্মীয়ের বাড়ি যান কিন্তু কিছুদিন থাকার সময় থাকে না। একান্ত নিজের আত্মীয় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ রাখতে তার কোনো আগ্রহ নেই। যৌথ পরিবারে কাকা-কাকিমা, জেঠা-জেঠিমা, দাদু-ঠাকুমা সবার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ও আন্তরিকতা অটুট ছিল। মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ছিল গাঢ়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনদের বিপদে-আপদে সবাই ছুটে যেতো, পাশে দাঁড়াতো। কেউ মারা গেলে সবাই শোক পালন করতো, ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াতো, সহানুভূতি দেখাতো। মানুষের দুঃখ-বেদনায় মানুষ পাশে থাকতো। বন্ধু-বান্ধব খুবই আন্তরিক ছিল। স্বার্থ ছাড়াই যোগাযোগ, কুশল বিনিময় হতো। বিপদে-আপদে বন্ধু-বান্ধবদের পাশে পাওয়া যেতো। কিন্তু বর্তমানে ভোগবিলাসিতায় মত্ত, অন্তহীন চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। অতি আধুনিকতার জীবনে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ছাড়া কারও প্রতি আন্তরিকতা ও অনুভূতি নেই।

সম্প্রতি মাত্রারিক্ত মোবাইলের ব্যবহার ও নেশার দ্রব্যে মত্ত যুবসমাজের অবক্ষয় হয়েছে। তাই এখনকার ছেলে-মেয়েরা নিজের বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য করে না। ভোগ-বিলাসিতায় মেতে থাকার জন্য বৃদ্ধ বাবা, মায়ের প্রতি অনুভূতি কমে যায়, ফলে তাদের স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে নতুবা ফুটপাতে। কলিযুগে মানুষের সহানুভূতি এতোটাই অবক্ষয় হয়েছে নিজের স্বামী, সন্তান ছেড়ে অন্য পুরুষ নিয়েও ঘর বাঁধছেন। আবার কেউ স্বামীকে খুন করছেন, কেউ-বা স্ত্রী-কে খুন করছেন। সম্পত্তির জন্য ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ঝগড়া ও লড়াই তো আছেই। আসলে বর্তমানে মানুষের মনের মধ্যে দয়া-মায়া, মমতা, অনুভূতি লোপ পেয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে লোভ, লালসা, হিংসা ও স্বার্থপরতা। তাই বর্তমানে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, ধর্মীয় বিভেদ অত্যধিক পরিমাণে বেড়েছে। মানুষ ক্রমে মানবযন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে। সুস্থ সামাজ গড়ে তুলতে ও মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পর্ক বজায় রাখতে আন্তরিকতা ও অনুভূতির একান্ত প্রয়োজন। মোবাইলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং মদ প্রভৃতি নেশা দ্রব্যের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেই সঙ্গে স্কুল, কলেজে নীতি শিক্ষামূলক পাঠদান করতে হবে।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

অবোধের গোবধে আনন্দ

'অবোধের গোবধে আনন্দ' এই প্রবাদটা খুব পুরানো। খুব বড়ো ধরনের বোকামির ক্ষেত্রে এই প্রবাদটা প্রয়োগ করা হয়। সাম্প্রতিককালে একটা বাংলা ধারাবাহিকে এই প্রবাদটা প্রয়োগ করা হয়েছে। বোকামির বা মূর্খতার অপর নাম হলো অবোধ। অর্থাৎ বোধহীন। গোবধ অর্থাৎ গোহত্যা। তাহলে কি সত্যিই বাঙ্গলার সুশীল সমাজ আজ অবোধ? তাহলে কি গর্বিত বাঙ্গালি বলার দিন শেষ? যদিও আজ বাঙ্গালি অন্য রাজ্যের মানুষের কাছে হাসির পাত্র হয়েছে। বহুদিন ধরেই আমরা কালিদাসের মতো আচরণ করে আসছি। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমরা মোটেই চিন্হিত নই। আমরা সবক্ষেত্রেই রাজনীতি পছন্দ করি। আর আয়নায় নিজেদের না দেখে অপরের দিকে আঙুল তোলা আমাদের খুব পছন্দ। যেমন বিজেপি ও সঙ্ঘকে ছোটো করতে আমাদের বাংলা সংবাদপত্র দেশের হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলকে 'গোবলয়' বলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। আমাদের যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ কয়েক বছর আগে শ্রীমতী স্মৃতি ইরানির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, বাঙ্গলার সেই বিদ্বান সমাজ আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের মন্ত্রীসভা গঠনের পর সেই মন্ত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে প্রশ্ন না তুলে নির্বাক ছিল। এই মানসিকতায় এই রাজ্যের মানুষ চুপ থাকলেও আমাদের উপহাস করতে ছাড়ে না অন্য রাজ্যের সুশীল সমাজ।

আমরাই রাজ্য থেকে টাটা শিল্পগোষ্ঠীকে তাড়িয়ে অবস্থান মঞ্চ থেকে রাইটার্সে পৌঁছে যাই। যাক না রাজ্যটা বছর দশেক পিছিয়ে। আমাদের শাসককুলও জানে, হাতে ৫০০ টাকা মাসে মাসে গুঁজে দিলেই কিস্তি মাত। আমাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যখন চাকরির পরীক্ষায় পাশ করেও বঞ্চিত হয়ে আজ রাস্তায় বসে, তখন মায়েরা ৫০০ টাকা হাতে পেয়ে খুশিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ঘর থেকে পাওয়া যায় কোটি কোটি টাকা। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিতে পারলেও পুলিশের কনস্টেবলের কাছে ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি পাওয়া যায়। আমরা সব জেনেও চুপ। বিনামূল্যে চাল দেবে মোদী

ফঃ ৩

আর কে দিল, বললে আমরা উত্তর দেব দিদি। এইতো আমাদের বিচার। ডিজেল, পেট্রল ও রান্নার গ্যাস নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। এদিকে আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ দরে আমরা কিনেও চুপ। জানি না কোন জাদু বলে এ রাজ্যে বিদ্যুৎ নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই? যে অঞ্চলে ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেওয়া হয় সেই অঞ্চলকে আমরা 'গোবলয়' বলে কোন আত্মসুখ লাভ করি? এদিকে আমাদের চাকরি, কয়লা, গোরু, বালি চুরি হয়। পাচার হয়। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের প্রতারণা করে গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তুলে হাওলার মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে গুটি কয়েক মানুষ লাভবান হলেও আমরা চুপ। এর পরেও কি বুকে হাত দিয়ে আমরা বলতে পারি, না আমরা অবোধ নই? আজ যদি ওই 'গোবলয়ের' মানুষরা আমাদের বলে, 'অবোধের গোবধে আনন্দ।' তবে তারা কি খুব ভুল বলবেন?

—শ্যামল কুমার হাতি,

চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

টাকা রূপ পরিবর্তন করে হাওলা হয়, অদৃশ্য হয় বিট কয়েনে

এক টাকার পাহাড়ের গল্প হলেও কিন্তু গল্প নয়। সত্যি। টাকার পাহাড়। সে আবার কী? 'চাঁদের পাহাড়' নয়! না, আমরা এখন টাকার পাহাড় দেখছি। দিনরাত দেখছি। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ছি, আবার জেগে উঠে দেখছি। এখন টাকার পাহাড় স্বপ্ন নয়, বাস্তব। দেখা যায়। চেষ্টা করলে হয়তো কখনো স্পর্শও করা যায়। রিজার্ভ ব্যাংকের এক অফিসার বলছেন— জীবনে অনেক টাকা দেখেছি কিন্তু এমন টাকার পাহাড় কখনোও দেখিনি। স্বপ্নকে আজ দুচোখ ভরে দেখে নিলাম। আহা আহা কী দেখলাম চোখ জুড়িয়ে গেল!

পূর্ণিমার চাঁদের মতো যখন টাকার পাহাড় দেখছিলাম, মুখটা কেমন চকচকে করে উঠলো। ভালো জিনিস দেখলে নাকি মনে আনন্দ জাগে। রোমান্টিক কবি শেলী বলেছেন, 'A thing of beauty is joy for ever'। টাকার পাহাড় দেখে এখন আমাদের তাই হয়েছে। বঙ্গের আকাশে আজ টাকার সূর্যোদয় হয়েছে। আমরা কী ভাগ্যবান! বঙ্গের যত জঞ্জাল, পাপটাপ ধুয়েমুছে এবার থেকে সাফ হয়ে যাবে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইন্দিরা উপন্যাসে টাকার বিছানা, টাকার বালিশে শুতে খুব ইচ্ছা জেগেছিল উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরার। তার এই ইচ্ছা এখন আর উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন টাকার বিছানা-সহ বালিশ পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দিরার মতো শুধু ইচ্ছা জাগলেই হয়, হয়তো কখনো শোয়াও যায়। টাকার পাহাড়ের মতো আমরা হিরের খনির কথা শুনেছি। হিরের রহস্য নিয়ে কত অ্যাডভেঞ্চার আছে। রূপকথার মতো কত রোমাঞ্চিত হই সেই গল্প শুনে। কোহিনুর মণি! আহা আহা কী মিষ্টি নাম! সে যেন আমাদের চোখের মণি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়ের বেকার, ডানপিটে শঙ্কর একদিন কাজের খোঁজে পাড়ি দিল উগান্ডাতে। সেখানে গিয়ে হিরের খনির সন্ধানে আফ্রিকার বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মরে। মরণাপন্ন হয়ে অবশেষে সে হিরের খনির সন্ধান পেয়েছিল। তাদের যদি হিরের খনি থাকে আমাদের টাকার পাহাড়! গর্বে বুক ভরে ওঠে। তাদের থেকে আমরা কত ধনী!

পাহাড়ের মতো এই টাকার পাহাড় নাকি মালিকানাহীন। সে নাকি পাহাড়ের মতো প্রকৃতির সৃষ্টি, স্বয়ংভু। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মতো সে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা নয়।' সে টাকা শুধু টাকা, মাটি কখনো নয়। মাটিতে থাকে না, সে রিজার্ভ ব্যাংকের এসি-তে থাকে, দেশ-বিদেশের ব্যাংকে থাকে তবে সুইজারসল্যান্ডের ব্যাংকে থাকতে বেশি ভালোবাসে। পরির মতো কখন সে অদৃশ্য হয়ে দেশ থেকে বিদেশে উড়ে যায়। সে হাওলা হয়ে রূপ পরিবর্তন করে, অদৃশ্য বিট কয়েনে। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমার নায়কের টাকার স্বপ্ন দেখতে দেখতে টাকা চাপা পড়ে মরার দৃশ্য দেখে দর্শকরা আঁতকে ওঠে। অবশ্য এই টাকার পাহাড় দেখে আমাদের ভয়ে আঁতকে ওঠার কিছু নেই। এখন সে অদৃশ্য হবে। জেগে উঠে আবার দেখবো। এখন বরং টাকার পাহাড় দেখতে দেখতে স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুমিয়ে পড়া যাক।

—সুবল সরদার,

মগরাবাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

স্বামীজীর বিশ্বজয়

স্বস্তিকা পত্রিকা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিশেষ প্রতিবেদন বিভাগে লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠীর লেখা 'বিনা রক্তপাতে বিশ্বজয়ের কাহিনি' পড়ে খুব ভালো লাগল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সনাতন হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামীবিবেকানন্দ ছিলেন একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি বিনা আমন্ত্রণে কপর্দকশূন্য অবস্থায় খুব কষ্টে কোনোক্রমে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোনো অনুমতি পত্রও ছিল না। আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে অনেক সুবিখ্যাত বক্তা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে বলার জন্য। ভারত থেকে আগত স্বামী বিবেকানন্দকে সবার শেষে মাত্র পাঁচ মিনিট কিছু বলার জন্য মঞ্চে ডাকা হয়েছিল।

স্বামীজী বিনারক্তপাতে বিশ্বজয় করেছিলেন, শুধুমাত্র ভালোবাসায়। 'আমার আমেরিকার ভাই ও বোনেরা' এই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণের কথা। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম সব ধর্ম থেকে কত মহান তা তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। এই ধর্মের মূল কথাই হলো ভালোবাসা। ঘৃণার বা হিংসার কোনো স্থান এই সনাতন হিন্দুধর্মে নেই। বিশ্বজয় করে তিনি ভারতবর্ষের মাটিকে প্রণাম করেছিলেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে দেখিয়েছিলেন শুধুমাত্র ভালোবাসার দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী ,

চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

মেয়েদের রোজগেরে হওয়াটাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়

অপর্ণা দে

স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। সাধারণ কথায়, স্বাধীনতা মানে অন্যের অধীনতা থেকে মুক্তি। আবার অন্য অর্থে স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা অর্থাৎ নিজের যুক্তি বিচারে যা করণীয়, সেটা করার সুযোগ। এর মানে এই নয় যে একজনের কাছে যেটা করণীয়, সেটা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষের অধিকারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন— সামাজিক, অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হলো, যোগ্যতানুযায়ী পছন্দমতো কাজ বেছে নিয়ে উপার্জন করা, নিজের উপার্জিত অর্থ নিজে ভোগ করা, দান করা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখার স্বাধীনতা। নিজের উপার্জিত অর্থে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা। আবার সেই সম্পত্তি ভোগ, বিক্রয় ও দান করার স্বাধীনতা। ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা থাকলেও নারী-পুরুষ একই রকমভাবে অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করেন না। নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজ এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুরুষদের ওপর। এদেশের অধিকাংশ মেয়ের নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া মালিকানা স্বীকৃত নয়। যেন তার একমাত্র লক্ষ্য হলো বিয়ে করে সংসারী হওয়া। বলা হয়, এই লক্ষ্য তার জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই নির্ধারিত। তাই বেশিরভাগ মেয়ের এই লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে ভিন্ন কিছু করার স্বাধীনতা নেই।

তবু স্রোতের বিপরীতে কিছু মেয়ে বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিজের জীবনের লক্ষ্য নিজেই স্থির করে, সেই লক্ষ্য অর্জনেও সক্ষম হচ্ছেন। রবীন্দ্রযুগেও সাধারণ মেয়ের ঘরের বাইরে যাওয়া অনুমতি ছিল না, উপার্জন করা তো ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। কয়েকজন মহামানবের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রচলন ভারতীয় নারীর জীবনে নবজাগরণ এনেছিল। নারীশিক্ষা যত প্রসারিত হতে লাগল, সেই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর চিন্তা ও চেষ্টা শুরু হলো। মেয়েরা চার দেওয়ালের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়া স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। একদিন সেই স্বপ্ন সত্যিও হলো। মেয়েরাও রোজগেরে হলেন। এখন মেয়েরাও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে পদচারণা করছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, উপার্জনশীল হলেই কি মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পান? যুগের পরিবর্তনে ও পারিবারিক প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করার অনুমতি দিলেও কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও অধরা। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বহু পরিবারে শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েদের বাইরে গিয়ে উপার্জন স্বীকৃত নয়।

তারমধ্যেও বহু বাধা অতিক্রম করে যেসব মহিলা বাড়ির বাইরে গিয়ে উপার্জন করেন তাদের সম্পর্কে একটা প্রশ্ন প্রতিনিয়ত মনে উঁকি দেয়— তাঁরা কি সবাই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন? অনেক উপার্জনশীল মহিলা আছেন যাঁদের উপার্জিত অর্থের মালিকানা নিজের থাকে না। মালিকানা থাকে অন্যের হাতে অর্থাৎ স্বামী বা পরিবারের কর্তার ওপর। এই সব মহিলার তাঁদের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের খরচের অর্থও মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়। বহু উপার্জনশীল মহিলা আছেন যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন অন্য একজন বা কয়েকজন। বহুক্ষেত্রে মহিলারা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া ও তোলার কাজটি করতে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন না।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেহেতু পরিবার আর পরিবার সমাজের অপরিহার্য একক, তাই পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেও আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারি। পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার দায় শুধু মহিলাদেরই নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও। আর দায়িত্ব পালন করার জন্য মহিলাদের সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা ত্যাগ করতে হবে তাও নয়। আসলে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগ করার বিষয়টি অন্যের স্বাধীনতার পরিমিত ভোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একজনের স্বাধীনতার যথেচ্ছ প্রয়োগ অন্যের স্বাধীনতা ভঙ্গ করতে পারে। বিষয়টি নারী-পুরুষ উভয়কেই উপলব্ধি করতে হবে। তবেই নারী-পুরুষ প্রত্যেক তাদের সব ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হবেন। □

সময়মতো সচেতন হলেই ক্রনিক কিডনি ডিজিজকে আটকানো যায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রতি বছর যে হারে কিডনির অসুখের সংখ্যা বাড়ছে এবং মানুষ সেই রোগের মুখোমুখি পড়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন করার সময় এসেছে। ভারতে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (সিকেডি) ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং প্রতি বছর প্রায় প্রতি মিলিয়নে (১০ লক্ষ) ৮০০ লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

কিডনির অসুখের অন্যতম সাধারণ কারণ হলো ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ। এই দুটো অসুখই আপনার জিনগত ও জীবনশৈলীগত দিক থেকে রোগের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই এগুলির মাত্রা যাতে সবসময়ে ঠিক থাকে, সেই বিষয়ে নজর রাখা দরকার। চিকিৎসকরা বলছেন, ওষুধ ও এক্সারসাইজ একসঙ্গে করে চিকিৎসা করলে কোনও ব্যক্তির পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব।

যেসব তরুণ-তরুণী ইতিমধ্যেই উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিতে আছেন তাঁদের কিডনি পরীক্ষা করিয়ে দেখা উচিত কী অবস্থায় আছে। সিকেডি নিয়ে চিকিৎসকরা এখন বেশি বেশি করে নজর দিচ্ছে, যাতে ধৈর্য সহকারে রোগটিকে সারানো যায় এবং এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে অবসাদও না আসে। এর জন্য ডায়েটে বদল, বিনা প্রেসক্রিপশনে দোকান থেকে পেইনকিলার কিনে না খাওয়া, ধূমপান ও অ্যালকোহল সেবন বন্ধ করার মতো কাজগুলি করতে হবে। সমস্যা দেখা দিলে নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া দরকার, বিশেষ করে কোনও ব্যক্তির যখন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এলডিএলের সমস্যা আছে।

বেশ কয়েক ধরনের কিডনির অসুখ ধরাও পড়ে দ্রুত এবং তার চিকিৎসাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সিকেডি আগে থেকে আটকানো সম্ভব যদি সতর্ক হওয়া যায়, না হলে এই রোগীদের চিকিৎসার খরচ খুবই ব্যয়বহুল।

সিকেডি আটকাতে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা আলোচনা করা হলো :

খুব প্রাথমিক অবস্থায় ইউরিন বা কিডনির সমস্যা যদি থাকে, তাহলে সিকেডি হয়েছে কিনা বা হলেও একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়মিত চেকআপ করিয়ে নির্দিষ্ট ডোজে ওষুধ ও খাবার খেতে হবে। অনেক সময়ে রোগ ধরা পড়তে দেরি হয়ে যায়। এর ফলে কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সে সময়ে চিকিৎসাও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাই প্রথমাবস্থায় রোগ ধরা পড়লে নিরাময়ের অনেকটাই সুযোগ থাকে।

নিয়মিত এক্সারসাইজ করে যান, এটি শরীর ভালো রাখার পাশাপাশি স্ট্রেস কমাতেও সাহায্য করবে। সিকেডির ক্ষেত্রে একবার চিকিৎসককে দেখালাম আর সেই ওষুধই খেয়ে গেলাম নিজের মতো করে এমনটা করবেন না। নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গেলে সময় বুঝে তিনি ওষুধ, ডায়েটে প্ল্যান ও কিডনির অসুখের পক্ষে যেটা সবচেয়ে জরুরি ওয়াটার ইনটেকের পরিমাণেরও হেরফের করবেন।

সিকেডির রোগীদের ডায়েটে প্রচুর বিধিনিষেধ থাকে। কতটা সোডিয়াম, কতটা প্রোটিন, সুগার খেতে পারবে তার মাপ থাকে। ফ্লুয়িড ইনটেকের মধ্যে চা, কফিকেও ধরা হয়। তবে সিকেডির রোগীদের খুব বেশি কফি না খাওয়াই ভালো। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে পুষ্টিবিদ আপনাকে ডায়েট তালিকা তৈরি করে দেবেন এবং সিকেডির রোগীদের সেটাই মেনে চলা উচিত।

কয়েকটি জিনিসের থেকে রোগীকে দূরে থাকতে হবে এবং সেটা আগে থেকেই বুঝে নিতে হবে, যেমন শর্করা, সোডিয়াম, স্ট্রেস, ধূমপান, সেডেন্টারি জীবনযাত্রা, অ্যালকোহল ও কোলাজাতীয় পানীয়। এগুলি প্রতিটিই ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পক্ষে বিষ।

যদি আপনার কোমরে ব্যথা, ঘন ঘন ইউটিআই হওয়া বা প্রস্বাব করতে গেলে তলপেটে অসুবিধা, একবারে প্রস্বাব না হওয়া সমস্যা থাকে তাহলে তা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দেখান, প্রয়োজনে উপযুক্ত পরীক্ষা করান। অনেক সময়ে প্রাথমিক অবস্থায় সিকেডির কোনও উপসর্গ থাকে না।

ডায়েটে তাজা ফল, সবজি, হোল গ্রেনস যুক্ত করুন। লো ফ্যাট ডায়েট মেনে চলুন। চিকিৎসকের পরামর্শে প্রত্যহ ২০ মিনিট ব্যায়াম করুন। রেইকির মতো বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি চলবে কী না জেনে নিন। প্রতিদিন রাতে আট ঘণ্টার ঘুম দরকার। স্ট্রেস কমাতে ধ্যান ও যোগব্যায়ামে ভরসা রাখুন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

দ্বেষ থাকলে দেশ গঠন মুশকিল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমাদের রাষ্ট্রপতি দেখতে কেমন? তিনি অনেকের ড্রিমগার্ল হলেন না। তিনি ১৪০ কোটি কিংবা বিশ্বের কোটি কোটির ড্রিমমেকার। যে যে প্যারামিটারে পুরুষের তন্দ্রাহারিণী হতে হয়, হয়তো তিনি তা নন; কিন্তু তিনিই দেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গী বদলের রূপায়ক। তথাকথিত রূপের ছটায় তিনি স্বপ্নে আসেন না কিন্তু যোগ্যতার লড়াইয়ে সবার ঘুম ছুটিয়ে দেন। তিনি দ্রৌপদী মুর্মু যিনি রূপসীদের চাইতেও অধিক সুন্দর। তবুও চামড়ার 'দোষ' যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। তাঁর মেধা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অন্য তুলাপাত্রে যখনই বাহ্যিক ত্বকের রং কোনো কোনো হীনমনারা পরিমাপ করে তখন 'দোষ' ঠেকে যায় রঙে। বাহ্যিক রূপশ্রীর বর্ণনায় তাঁকে বৈষম্যের শিকার করা হয়। এ কেবল একা একজন দ্রৌপদী মুর্মুর উদ্দেশে অবমাননা নয়, এ আসলে সমাজের এক বড়ো অংশের মনে লুকিয়ে থাকা বর্ণবৈষম্যের বিষ। বিশেষ করে স্ত্রীজাতিকে যারা পরিমাপ করে চামড়ার রঙে, শারীরিক আকৃতিতে। যে সমাজে একজন মহিলার জন্য 'পহলে দর্শনধারী'-টাই প্রথমে স্থান পায়। কিন্তু সবসে পহলে গুণ বিচারীর মূল্যায়নে আজকেও অনেক প্রতিবন্ধকতা। সে প্রতিবন্ধকতা চিন্তায়, রুচিতে ও পরিমাপবোধে।

এক নারীকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে চামড়ার প্রতি অবসেশন কবে কাটবে আমাদের? রেসিজিম ও সেক্সিজম এক মুদ্রার দু' পিঠ আসলে। কালো চামড়া হলে সে মোহান্বিত করবে কেমন করে? তাই তার উদ্দেশে শ্লেষ কটূক্তির তির্যক মন্তব্য যেন ছেলেখেলা বিষয়। আমাদের দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে অ্যানা জুলি কুপার (১৮৫৮- ১৯৬৪) কে হননি কটাক্ষের শিকার? সুন্দর ছেড়ে এ সমাজ চুপ চুপ করে কেবলমাত্রই সুন্দরীর খোঁজ করে চলে, তাই একটু খোঁচা পড়লেই প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত আসে কালো মেয়েদের দিকে। আমরা প্রতিবেদন পড়ি সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম বিষয়ে, বড়ো বড়ো সব শব্দের জালে হাবুডুবু খায় লম্বা চওড়া গবেষণাপত্র। কিন্তু এতোকিছু ছেড়ে ঠিক কতটুকু স্ব-শিক্ষিত হলে সুশীল সুশিক্ষিত হওয়া যায় এবং মেয়েমানুষদের শুধুমাত্র চামড়ার রূপে না মেপে 'মেধার রূপে' মাপা যায় সে বোধের আয়োজন এখনও শিক্ষিত সমাজ করতে পারছে না।

আজ খুব bold and snappy tongue-এ থাকতেই হচ্ছে, মারিয়া স্টুয়ার্টের মতো মনে হচ্ছে আজকের দ্রৌপদী মুর্মু বা তাঁর মতো সবাইকে যারা কৃষ্ণাঙ্গের, যারা মেঘলা প্রান্তিক সমাজের কিন্তু জগতের আলো। মারিয়া ছিল বলেই একদিন সারাবিশ্ব মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল কালোরাও ভালো হয়। সেই মেনে নেওয়া আইনের শাসনে, মানবাধিকারের টুঁটি চেপার ভয়ে এবং বিশ্বায়নের সময় থেকে উদারতা প্রদর্শন হয়ে উঠল একটা বিজ্ঞাপনের চমক। কালোদের মেনে নেওয়া এবং প্রকৃত মনে নেওয়ার মধ্যে এক সমুদ্র তফাত এবং তা আবার প্রমাণিত হলো যখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারীর চামড়ার রঙে ব্যঙ্গের টিপ্পনী দেয় এ দেশেরই মার্কামারা ব্রাউন এশিয়ান স্কিন। যে টিপ্পনী দেয় সেও হয়তো স্কিনটোনের হিসেবে কালো কিন্তু তার দোষ নেই, কারণ সে পুরুষ। এবং সেই সব স্থূল পুরুষতান্ত্রিকতার বিনোদন না হয়ে যখন কৃষ্ণাঙ্গের দ্রৌপদী দেশের সর্বোচ্চ পদের পূজারি হন তখন চামড়া মোটাদের একটাই ছুঁতো পড়ে থাকে— চামড়া নিয়ে মশকরা করা।

আমাদের দেশে যে মা কালীর উপাসনা করা হয় তা আসলে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম, যেখানে কালোমেয়ে তার স্বপ্রতিভতায় পূজিতা। সে মোহিনী রূপ ত্যাগ করে প্রতিবাদী রূপে আবির্ভূতা। তবুও আমাদের মনন থেকে কলোনিয়ালিজমের বাই প্রোডাক্ট পিছু ছাড়তে নারাজ। কালো মেয়েদের বেশি পরিশ্রমে একটু বেশিই প্রমাণ করতে হয়, এমনকী রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেও সে প্রক্রিয়ার অন্ত নেই। বেল হুকসের কথায় বলতে হয়— Ain't I a woman : black woman and feminism— ১৯৮১-তে প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব স্থূল মনের জন্য, যারা কালোদের পিছিয়ে রাখে তাদের বিরুদ্ধে সজোর আঘাত। বার বার কালো মেয়েদের অধিকার এবং সম্মান যুদ্ধে পশ্চিমের উদাহরণ আসছে, কারণ অপ্রিয় হলেও এটাই সত্যি; ওদের মেয়েরা যখন প্রতিবাদী এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব তখন এ দেশ তা সমর্থন করছে আবার একটা সিংহ ভাগের মানুষ ফর্সা পাত্রীর সন্ধানে ব্যস্ত। তাই ফর্সা হতে পারেনি ভাবনা মানসিকতা এবং বিচারের ক্ষেত্র। একই ক্রুয়েল ভুলের ফাঁদ থেকে মুক্ত নয় আমাদের সমাজ।

মেঘমল্লারের কালো জল থেকেই তো দেবী সরস্বতীর বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত রূপ ফুটে উঠেছে। ইংরেজরা শিখিয়ে দিয়েছিল কালো মানেই তা একটু হলেও মন্দ। সে ভাবনাতেই আমরা মগ্ন। যে বিষয় মন্দ তাকে অবলীলায় বলে 'ব্ল্যাক লিস্টেড'। এখানেই

হয়তো গোড়ায় গলদ যা কালো ও মন্দকে সহাবস্থানের পথ প্রশস্ত করাচ্ছে। তাই মানুষের বিশেষ করে একজন মেয়েমানুষের যেই না গায়ের রং কালো হয় অমনি তিনি মন্দ হয়ে যান। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০১৮-তে এক বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়াগুলি সার্ভে করে। যা তিন বছরের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে করা গবেষণা। 'Troll Patrol' তৈরির পর নিয়ম হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়াতে বর্ণবৈষম্যের কথা ও মন্তব্য বারণ। সোশ্যাল মিডিয়াতে না হয় বারণ কিন্তু সোসাইটিতে? সে বাঁধন বারণ কে করবে! করা যাচ্ছে না বলেই তো দ্রৌপদীদের আজকেও কটাক্ষ ও অবমাননার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ হিসেবে যতটা না অবমাননার শিকার দ্রৌপদী মুর্মু তার চেয়েও ঢের বেশি বিদ্রূপ জুটেছে, কারণ তিনি কালো মেয়ে। যে সমাজের মনস্তত্ত্বর পরিসরে অনেক কালো ছেলেরা পার পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক যোগ্যতার পরেও বহুমুখী আক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ চলে 'সাবঅলটার্ন' মেধার দ্রৌপদীদের।

আমাদের দুটো দেশ তৈরি করতে হবে। একটা দেশ বৈষম্যহীন এবং আর একটা বৈষম্যহীনতা অভ্যাস করছে তো করছেই। একটাদিন ইতিহাসে লেখা আছে। ১৯৬৯-র ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের সফর শুরু হতে চলেছে। তখুনি বর্ণবৈষম্যবিরোধী ডেভিড উইল্টন গডবেরফোর্ড হুমকি দিয়ে বলেছিলেন— 'দেখি খেলা কী করে হয়।' পিটার হায়েন, ডেনিস ব্রুটাস খেলার মাঠে শুরু করেছিলেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঠের ঘাস ছেঁড়া। বর্ণবৈষম্যের চেয়ে বড়ো বিপথগামিতা আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ যেমন দ্রৌপদী মুর্মু যোগ্যতার শিখরে এসেও বর্ণের জন্য আপত্তিকর মন্তব্য শুনলেন, এ ব্যাধির জন্যই একদিন 'অ্যাপার্থায়েড ল'-এর সূত্রপাত হয়েছিল। ক্রম হেন্ড্রিক্স শুধু চামড়ার রঙের জন্য বল করতে পারেননি। প্রতিভার উন্মেষশীলতা রঙের জন্য আটকে গেছে অনেকবার। আমরা এখনও মুখের ভাষণে সাবভার্সিভ রয়ে যাচ্ছি। প্রকৃত সাবভার্সন তখনই হবো যখন একটা মানুষের বিবরণে তার রং বা দেহাকৃতির বর্ণনা বন্ধ করব। সমাজের বড়ো অংশকে সেই অলিভিয়েরা অ্যাফেয়ার্সের মতো ভূমিকায় আসতে হবে।

কৃষ্ণাঙ্গের খেলা মানাতে নারাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, তাই ওদের সঙ্গে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একে একে সব দেশ সম্পর্ক ছিন্ন করা শুরু করেছিল। জিজ্ঞাসা উঠেছিল কৃষ্ণাঙ্গের কেন তাচ্ছিল্য! এই মানসিক নিগ্রহ কেন? কৃষ্ণাঙ্গের আওয়াজ ছিল 'no normal sports in abnormal society'— তাই দ্রৌপদীদেরও একই বিরক্তি থাকছেই— একটা ভদ্র সমাজের মধ্যে বর্ণ, রূপ, দেহের আকার ইত্যাদি বিষয়ে কটাক্ষ এবং বিদ্রূপের অবিরাম ধারায় কেন ছেদ পড়ে না। আইনের সংশোধন হয় কিন্তু ভাবনার অভ্যাসের হতে আর কত সময় লাগবে। এও তো একরকম 'enemy within' তত্ত্ব বই আর কিছুই নয়। একটা শ্রেণীর মানুষ টিকিয়ে রাখতে চায় বর্ণবৈষম্য, জিইয়ে রাখতে চায় রূপসী মাকালফল স্বপ্নচারিণীদের 'অ্যাডভানটেজ' নেওয়ার আনাগোনা যারা যোগ্যতমের উত্তরণে প্রতিবন্ধকের কাজ করবে। মুখে লম্বা চওড়া ভাষণের শেষে যারা কন্যাকে বলে— কালো তাই পড়াশোনাটা কর। বর্ণবৈষম্যের আঁতুড়ঘর নানাভাবে এখনও লালিত পালিত হচ্ছে। দ্রৌপদী মুর্মুর অবমাননা তার চূড়ান্ত উদাহরণ, যা অসাংবিধানিক, তাই এতো চর্চার বিষয়। কিন্তু বৈষম্যের এলোপাথাড়ি হাওয়া সদা বহমান।

অত্যন্ত সংবেদনশীল সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রৌপদী মুর্মুর উদ্দেশে অবমাননাকর মন্তব্য বিষয়ে অধিক আলোচনা করছি। এখানে যেমন একদিকে উগ্র পুরুষতান্ত্রিক ফৌজদারি মনোভাব দেখা গেছে তেমনই নারীর মূল্যায়নের নীরব মাপকাঠি তার রং এবং আকৃতি, যোগ্যতা যে আজকেও সর্বজনীন জোর পায়নি তার কুৎসিত প্রমাণ।

আসল সত্য এটাই, সমাজের একটা অংশ Theories of Discrimination-এ বিশ্বাস করে। ১৯৫৪-তে যখন গর্ডন অ্যালপোর্ট কম্প্রিহেনসিভ সোশ্যাল সায়েন্স নিয়ে মানুষকে বোঝাচ্ছেন তখন verbal antagonism-এর বিবরণ দেন। এ যে মারাত্মক ব্যাধি, মগজের বিকৃতপনা এবং সংস্কৃতির

অপদার্থতা। যেখানে যে আমার মতো নয় তাকে যা ইচ্ছে বলা এবং প্রকাশ্যে বলে সুখ নেওয়া। অর্থাৎ immediate dislike মানেই তাকে বা তার সম্প্রদায়ের ওপর তীব্র আপত্তিকর মন্তব্য যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ নিজের বাহাদুরি প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই যে হঠাৎ করে সুশিক্ষিত তথাকথিত সুশীল ভদ্রলোক বেশধারী প্রাক্তন খ্যাতনামা আমলা জহর সরকার ট্যুইট করলেন— যা এক কথায় পায়ে পা দিয়ে বিদ্বেষ এবং বৈষম্যমূলক মন্তব্য করা। ঐতিহাসিক বিক্রম সম্পতকে উদ্ধৃত করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক আনন্দ রঙ্গনাথন ট্যুইট করেন যা সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। যে ট্যুইটে তিনি লিখছেন— ইসলামিক বিজয় ছিল ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী পর্ব। খিলজির নামে নালন্দার কাছে একটি রেলওয়ে স্টেশনের নামকরণ করা সেই প্রেক্ষিতে বিদ্রূপাত্মক। তিনি নিজে নালন্দাকে পুড়িয়েছিলেন।' জহর সরকার এর প্রতিক্রিয়ায় আচমকাই এক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ট্যুইট করে বসলেন যার না আছে কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা ও যৌক্তিকতা। মাত্র ১ শতাংশ মানুষের ব্রাহ্মণ্যবাদের ফলেই বুঝি ইসলামোফোবিয়ার জন্ম। এ কেমন যুক্তি!

তবে তো বিশ্বের অসংখ্য দেশেই মোল্লাবাদের দৌরাত্ম্যে ইসলামোফোবিয়া তীব্র। সেসব দেশ ক্যাথলিক এমনকী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের, সেক্ষেত্রে তিনি কী যুক্তি দেবেন। জহর সরকারের ট্যুইটে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, এতোটাই ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ যার ফলে তিনি সম্ভবত ঐতিহাসিক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝাঁর অনুগামী। তাই শ্রী সরকার ট্যুইটে উল্লেখ করেন ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার হেতু এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার পায়নি। বিভ্রান্তিমূলক তথ্য যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পদলেহনকারী ঐতিহাসিক ঝাঁ একসময় প্রচার করতেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের একটা সময় 'কেজিবি'র বিশেষ আদরে হিন্দুবিরোধী এবং ইসলাম তোষণের ইতিহাস প্রচারে তোষামোদ করা হতো। রিস ডেভিসের তথ্য যা বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ইতিহাস দলিল তাতে কোথাও জহর সরকারের ইতিহাস জ্ঞানের সঙ্গে মিল নেই। তাছাড়াও ভিনসেন স্মিথ থেকে হিউ এন সাং কিংবা ফা হিয়েন বা আধুনিককালে আলেকজান্ডার কানিংহাম রিপোর্ট কোনোটাতেই বৌদ্ধদের ওপর হিন্দুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণ অত্যাচারের একটাও তথ্য, মন্তব্য বা বিবরণ পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিক ব্রজলাল ভার্মার তথ্য তত্ত্বর সঙ্গেও জহর সরকারদের বিকৃত ইতিহাসের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

বিদ্বেষমূলক মন্তব্য যে কেবলমাত্রই রাজনৈতিক সভার উত্তেজনায় উদগারিত হয় এমন নয়। বিদ্বেষ এক সাংস্কৃতিক ক্লীবতা যা একাত্ম হতে পদে পদে বাধা দেয়। কখনও বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস বলে, কখনও আমরা-ওরার ভেদাভেদ রেখে, কখনও রং তো কখনও গোত্র-ধর্ম- ভাষা ইত্যাদি যেটা যখন সুবিধাজনক ভাবে আক্রমণ করা যায়, যে আক্রমণে একটা শ্রেণীর বা মানুষের আপাত দুর্বল কোথাও আঘাত করার একচুলও অবকাশ থাকে তা ষোলোআনা পুষিয়ে নেওয়ার যে নেশা তারই নাম বিদ্বেষ। বিদ্বেষ বাষ্প একটা শ্রেণীর উত্তরণ চায় না। এক শ্রেণীর জড় পুরুষতান্ত্রিকতা নারী প্রগতির প্রতি বিদ্বেষী, আরও বিদ্বেষী যদি তিনি প্রান্তিক নারী হন। যদি তিনি মেঘলা হন তখন তাতে বিদ্বেষ ও উপহাস, এক শ্রেণীর মানুষ জাতপাত শ্রেণী বিন্যাসে মগ্ন এবং অতি উচ্চশিক্ষিত সমাজের একাংশ মেধার মধ্যেও বিদ্বেষ প্রসার করেন— যেমন জহর সরকারেরা। জহর সরকার ট্যুইট মুছে ফেললেন। তাতে তো বিদ্বেষী মন ছাইচাপা থেকেই গেল। সুযোগ পেলে তা আবার মিথ্যা প্রচারের লাভা হবে। দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি অবমাননা প্রসঙ্গ অতি স্পর্শকাতর এবং আধুনিক সমাজের কলঙ্ক। করোনা কালে যেমন মাইক্রো কনটেইনমেন্ট তৈরি হয়েছিল— হয়তো দেশ সমাজকেও তাই করতে হবে এই স্থূল ভাঁড় বিদ্বেষীদের গুঁতোয়। যেখানে শ্রেণীর পর শ্রেণী বিন্যাস চলতেই থাকবে এবং এক একটা দ্বীপের মতো সবাই থাকবে। গঠনশীল সমাজের প্রথম দায়িত্ব বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রং আকৃতি পাশে ফেলে সমসত্ত্ব সমাজ ও কর্মসংস্কৃতি গঠন করা। বিদ্বেষ আসলে বিদ্বেষীর দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রের মরচে ধরা মগজ।

অখিল গিরির মুখনিঃসৃত বাণী এবং সমাজ ও রাজনীতির উপর তার প্রতিক্রিয়া

বিমল শংকর নন্দ

শতপথ ব্রাহ্মণে 'শব্দ ব্রহ্ম' কথার উল্লেখ আছে। শব্দ ব্রহ্ম কথার অর্থ হলো অতীন্দ্রিয় ধ্বনি। তবে অপপ্রয়োগ হলে সেই সেই শব্দই ব্রহ্ম না হয়ে রাক্ষস রূপ ধারণ করতে পারে। স্রষ্টাকেই গিলে ফেলতে পারে। একথা কেউ বুঝুক না বুঝুক পশ্চিমবঙ্গ সকারের কারা দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অখিল গিরি বিলক্ষণ বুঝেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে তাঁর করা কুৎসিত মন্তব্য চারিদিকে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে যে তাঁকে নানা সাফাই দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে হচ্ছে, তাঁর মুখ্যমন্ত্রীকে এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছে, তিনি নিজে ক্ষমা চেয়েছেন। তাতেও পরিস্থিতি কতটা সামলাতে পেরেছেন এই মুহূর্তে বলা কঠিন। এই অভিজ্ঞতার পর আগামীদিনে মন্ত্রীমশাই যদি মৌনব্রত অবলম্বন করেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মন্ত্রীমশাই ঠিক কী বলেছিলেন সেটা এখন সবাই জেনে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বলে ফেলার পর অস্বীকার করা কঠিন। সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে এগুলো আগুনের মতো ছড়ায়। তাই আগুন নিয়ে খেলার আগে ভালো করে ভেবে খেলা শুরু করা উচিত। নয়তো সেই আগুনে নিজে পুড়ে খাক হয়ে যেতে হবে। তবে সত্যি কথা বললে বলতে হয় খেলাটা শুরু হয়েছে আগেই, আর এই খেলা অখিল গিরিও শুরু করেননি। এই খেলায় আরও অনেকের মতো তিনিও একজন খেলোয়াড়। তবে প্রায়ই ফাউল করে ফেলেছেন। পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যখন গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যান তখন অনেক ডিফেন্ডার কিছু করতে না পেরে ধৈর্য হারিয়ে পা চালিয়ে দেন। এটাও অনেকটা সেই রকম। এই বিপজ্জনক খেলার সূত্রপাত হয়েছে ২০২১-এর ২ মে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য জিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলেও সেই জয়ের স্বাদ তেতো হয়েছিল নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ে। কারণ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে আর কেউ নন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজেই ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই তাঁকে পরাজিত হতে হলো। এই পরাজয় সারাজীবন তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে একটা বড়ো দাগ হয়েই থেকে যাবে। বিধানসভায় জিতে তৃণমূল কংগ্রেস দল ক্ষমতা দখল করেছে। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে

পরাজিত হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। পরে অবশ্য আবার তাঁকে ভবানীপুরে উপনির্বাচনে লড়াই করে জিতে আসতে হয়। আর নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জেতা বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী হয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ২ মে ২০২১-এ পরাজয়ের পর বিজয়ী দলের ভয়ংকর আক্রমণে সাময়িক ভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়লেও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। আর শাসক দল ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে। মেদিনীপুরের এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্মাবার ফলে এবং অনেকদিন রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা থাকার ফলে শুভেন্দু অধিকারী অতি দ্রুত হয়ে উঠেছেন বাঙ্গলার এক আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় জনতা পার্টির আরও অনেক নেতার মতো তিনিও শাসক দলের সামনে এক বড়ো 'থ্রেট'। আর শুভেন্দু হারিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রীকে। ফলে তাঁর প্রতি শাসক দলের বিশেষ নজর থাকবে এটা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিগত বেশ কয়েক দশক ধরেই ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করতে, সমাজে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্মদাতা বামপন্থীরা। এর ধারক ও বাহক হলো এখনকার শাসক তৃণমূল কংগ্রেস দল। তাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে কোনো 'থ্রেট'ই তাদের কাছে আতঙ্কের। তাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দল বা সিপিআই(এম)-এর মতো দল তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নয়। সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। এই কারণে শুভেন্দু অধিকারীও শাসক দলের আক্রমণের অন্যতম নিশানা। এই আক্রমণে যেমন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা বা বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয় থাকে তেমনি থাকে মৌখিক আক্রমণ। অখিল গিরি 'বচন' এই ধারায় রাজনীতির নবতম সংযোজন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে মন্ত্রীমশাই যে লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি। গত ১১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরে এক সভায় (যে সভায় রাজ্যের অন্য একজন মন্ত্রী, শাসক দলের কয়েকজন ওজনদার নেতাও উপস্থিত ছিলেন) বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্রীমহোদয় শুভেন্দু

ফঃ ৪

অধিকারীর সমালোচনা করতে গিয়ে বলে ফেলেন 'তোমার রাষ্ট্রপতিকে কেমন দেখতে বাবা'? গণমাধ্যম বিশেষত সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে বক্তব্যটি নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায়। তবে এই প্রথম নয়, গত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখেও মন্ত্রীমশাই রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন। এখানেই প্রশ্ন উঠছে শাসক দলের সংস্কৃতি ও মানসিকতা নিয়ে। গোটা ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন এর প্রতিবাদ করছে। প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে 'উন্নয়ন' শব্দটি কি কেবল ক্ষমতায় থাকার জন্য ব্যবহৃত শব্দ? আসলে কি দলটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক এলিটবাদী মানসিকতা? এই প্রশ্নগুলো উঠে আসছে বারবার।

লন্ডনে রানির অন্ত্যেষ্টিতে দ্রৌপদি মুর্মু।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে মর্যাদা পায়। তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যার কতগুলো ক্ষেত্র আছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনীতিতে পরিবারবাদ, এলিটবাদ ভারতীয় রাজনীতির দুর্বল জায়গা হিসেবেই চিহ্নিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষমতা কাঠামোর মূল কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াই চলছে এসবের বিরুদ্ধে। বিগত ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে ভারতের ১৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর শপথ গ্রহণ ছিল এলিটবাদী, পরিবারবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। ওড়িশার এক দরিদ্র সাঁওতাল উপজাতি পরিবারে জন্ম নেওয়া দ্রৌপদী মুর্মুর জীবন ও সংগ্রামের কাহিনি গল্প উপন্যাসকেও হার মানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের মতো তথাকথিত উন্নত পশ্চিমি গণতন্ত্রও দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের কাউকে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে বসাতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেড ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বহু দূরে আছে। অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থানে আজ এক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সমাজের দূরতম স্থানটিতেও ছড়িয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাস করে এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র প্রার্থী ছিলেন পিএ সাংমা, যিনি ছিলেন উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয়ের এক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। সে সময় কিছু বিজেপি বিরোধীর অভিযোগ ছিল ক্ষমতায় নেই বলেই বিজেপির এই উপজাতি দরদ। ক্ষমতা পেলেই এই দল উচ্চবর্ণের আধিপত্যের ব্যবস্থায় ফিরে যাবে ইত্যাদি। বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ-র প্রার্থী হন রামনাথ কোবিন্দ যিনি এক পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি হলেন শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। ভারতীয় রাজনীতি থেকে এলিটবাদ ও পরিবারবাদকে মুছে ফেলতে এগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

কিন্তু এলিটবাদ যে মানুষের মনোজগতে এখনো বাসা বেঁধে আছে তার প্রমাণ রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিল গিরির এই উক্তি। এই উক্তি মুখ ফসকে বলা কোনো কথা নয় বা যেমন বলা হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর নিরন্তর সমালোচনা কিংবা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ধৈর্য হারিয়ে বলে ফেলা কোনো কথা নয়। এটা অবশ্যই এলিটবাদী মানসিকতা। বিশিষ্ট ইতালীয় দার্শনিক প্যারেটে তাঁর 'সার্কুলেশন অব এলিট' তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে এলিটরা। যারা এলিট বৃত্তের বাইরে থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসে তারাও ক্রমেই এলিট হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই এলিটবাদকে পুষ্ট করা হয়েছে দীর্ঘদিন। পরিবারবাদও এই এলিটবাদেরই আর এক রূপ। তৃণমূল মন্ত্রীর কুকথার মধ্যে কোথাও প্যারেটোর ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের রাজনীতিতে বহুদিন ধরেই উদারবাদ, বামপন্থা, এলিটবাদ পাশাপাশি অবস্থান করছে। পরস্পরকে পরিপুষ্ট করেছে। হিন্দুত্ব, দেশপ্রেম এদের কাছে গুরুত্বহীন। এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈচিত্র্য, বহুত্ব। বৈচিত্র্য বা বহুত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা হিন্দুত্ব কিংবা দেশপ্রেমের বিকল্প নয়। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে এখন হিন্দু চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুত্বের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানোর বাম উদারবাদী মানসিকতা এখন নিজেই প্রশ্নের মুখে। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। আমাদের হিন্দুত্ব, দেশপ্রেমকে কোনোকিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। শুভেন্দু অধিকারী সমস্ত হিন্দুদের এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপটিকে ধরে রাখতে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। ■

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে দেব দীপাবলী উদ্‌যাপন

গত ৫ নভেম্বর কলকাতা মহানগরের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক সংস্থা রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় তারাসুন্দরী পার্কে খুব হর্ষোল্লাসের সঙ্গে দেব দীপাবলী উদ্‌যাপিত হয়। বহু মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা অখিল ভারতীয় সেবা টোলির সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। তিনি বলেন, দেব দীপাবলী সারা ভারতে হর্ষোল্লাসের সঙ্গে পালন করা হয়। কলকাতাতে যেমন পালন করা হচ্ছে, তেমনই শিবভোলানাথের নগরী কাশীতেও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কলকাতা পশ্চিমভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মানন্দ বংগ্, সহ সঙ্ঘচালক মহাবীর বজাজ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, রামমন্দির অন্দোলনে বলিদানী রামকুমার-শরদকুমার কোঠারীর ভগ্নী পূর্ণিমা কোঠারী , সংস্থার অধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল(লালা), ২৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজয় ওঝা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত এবং বৃন্দাবনের পূজনীয় সন্ত ভারতদাসাচার্যজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে অযোধ্যায় নির্মীয়মান রামমন্দির এবং রামদরবারের উদ্দেশে ফুলের আলপনার মাঝে এক হাজারটি প্রজ্বলিত প্রদীপ বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। আতশবাজির রোশনাইয়ে চারিদিক আলোকিত ছিল। অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেন অশোক জয়সোয়াল, অনিতা বুবনা, আনন্দ জয়সোয়াল, সঞ্জয় মণ্ডল, রজত চতুর্বেদী, প্রদীপ আগরওয়াল, পঙ্কজ চৌধরী, রোহিত শর্মা, বিশাল বাগলা, অভিষেক বজাজ, চন্দ্রশেখর বসোতিয়া। সঞ্জীব মানসরিয়া, রেণুকা শর্মা, পুনম গৌণ্ড, গুরুদত্ত শর্মা ও রাজলক্ষ্মী রাঠী।

জাগ্রত বাঙ্গলা মুম্বাই শাখার প্রীতি সম্মেলন

জাগ্রত বাঙ্গলা মুম্বাই শাখার উদ্যোগে গত ১৪ নভেম্বর কান্দেরবলি ঠাকুর কলেজের ঠাকুর ভিলেজে বিজয়া ও দীপাবলীর প্রীতিসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুম্বাই মহানগর কার্যবাহ সঞ্জয় নাগরকর এবং জনকল্যাণ সমিতি ভিনদোশী ভাগের অধ্যক্ষ শিবকুমার বাগলাকে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষধের মুম্বাই শাখা দুর্গাবাহিনীর পূজা মিত্র এবং মহাকালী পূজা কমিটির অধিকর্তা কমল বসাক। গান ও কবিতা পাঠে পরিবেশ আনন্দমুখর করে তোলেন বঙ্গভাষী সদস্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সংযোজক রঞ্জন চৌধুরী।

মারুতি সেবা সমিতির 'মারুতি বন্দন' অনুষ্ঠান

কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা মারুতি সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর স্থানীয় বিন্নানী সভাগারে 'মারুতি বন্দন' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামেশ্বরনাথ মন্দিরের পূজ্য স্বামী ভাগবতাচার্য শ্রী ত্রিভুবনপুরী মহারাজ। তিনি বলেন, হনুমানজী হলেন প্রত্যক্ষ দেবতা। তিনি লঙ্কা দহন করার সমস্ত শ্রেয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে নিজের মনে কোনোপ্রকার অহংকার আসতে দেননি। সেরকমভাবেই সেবাকাজ করার সময় বিনম্র হয়ে করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন যে অখণ্ড ভারতের সংকল্পকে সাকার করতে হবে। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, 'আমাদের সকলকে হনুমানজীর থেকে প্রেরণা নিয়ে সমগ্র বিশ্বকে শ্রীরামের স্বরূপ মনে করে সেবাকাজ করতে হবে।' অতিথিদের স্বাগত জানান সমিতির অধ্যক্ষ রাজেন্দ্র দুবে, ওমপ্রকাশ শর্মা ও সিদ্ধার্থ সিংহ। সারাদিনের অনুষ্ঠানে মারুতি পূজনের সঙ্গে সঙ্গে ৮০০ ভক্ত দ্বারা সমবেত হনুমান চাল্লিশা পাঠ হয়। সীতারাম সৎসঙ্গ সমিতির সদস্যরা সমবেত রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠ করেন। তারপর উপস্থিত ভক্তরা ভারতমাতার চিত্রের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অখণ্ড ভারতের সংকল্প গ্রহণ করেন। আরতি সমাপন্তে ভাণ্ডারার (প্রসাদ) আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহাবীর প্রসাদ রাওত।

ডিডওয়ানা নাগরিক সমিতির দীপাবলী প্রীতিসম্মেলন

'যুবা প্রজন্মের মধ্যে অপার প্রতিভা ও যোগ্যতা রয়েছে। আত্মবিশ্বাস, অধ্যয়ন, গুরুজন এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের তরুণ ও যুবা প্রজন্ম তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে'— কলকাতার ডিডওয়ানা নাগরিক সভার উদ্যোগে স্থানীয় হিন্দুস্থান ক্লাবে আয়োজিত দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে কথাগুলি বলেন প্রখ্যাত উদ্যোগপতি শ্রী সিমেন্টের চেয়ারম্যান তথা সমাজসেবী বাবু হরিমোহন বাঙ্গর। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। প্রীতিসম্মেলনে শিক্ষা প্রতিভা এবং ডিডওয়ানা গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়। এবছর ডিডওয়ানা গৌরব সম্মান ২০১৫-র RAS Topper শ্রীমতী রাধিকা দেবীকে প্রদান করা হয়। সম্মানিত রাধিকাদেবী বলেন, 'ডিডওয়ানা প্রবাসীদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ এই সম্মান শিরোধার্য করে আমি গৌরব অনুভব করছি।' তিনি শিক্ষা প্রতিভা সম্মানপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীদের শুভকামনা জানান। অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেন ওমপ্রকাশ বাঙ্গর, রাজগোপাল পসারী, দিনেশ ভারুকা, ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা, রাজেশ নাগোরী, দেবেন্দ্রসিংহ মোহনোত, মনোজ কাকড়া, সম্পত মানধনা, ড. শ্রীবল্লভ নাগোরী, অশোক সিংঘবী, দেবেন্দ্র বাঙ্গর, রাজেন্দ্র সেঠিয়া, শর্মিলা পসারী, মঞ্জু বাঙ্গর, সুমন তিওয়াড়ী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন নাগরিক সভার সম্পাদক হরিশ তিওয়াড়ী এবং ধন্যবাদ জানান নাগরিক সভার অধ্যক্ষ অরুণপ্রকাশ মল্লবত।

রাজা সুহেলদেবের কারণে দেড়শো বছর বন্ধ ছিল ইসলামি আগ্রাসন

উত্তম মণ্ডল

সময়কাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের প্রথমদিক। স্থান উত্তর ভারতের গঙ্গার উত্তরে এবং রাপ্তি নদীর দক্ষিণ তীরে কোশল রাজ্যের এক সমৃদ্ধিশালী নগরী শ্রাবস্তী। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর বনলতা সেনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' সেই শ্রাবস্তীর রাজা তখন সুহেলদেব।

রাজা সুহেলদেব! এই নাম থেকে শত আলোকবর্ষ দূরে রাখা হয়েছে বর্তমান ইতিহাসকে। সৌজন্যে ভারতীয় ইতিহাস লেখার ঠিকেদাররা। 'ঠিকেদার' কথাটা ব্যবহার করা হলো এই জন্য, কারণ সজ্ঞানে ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে সুলতান মামুদ থেকে মহম্মদ ঘোরির মাঝের দেড়শো বছরের ব্যবধানের কালখণ্ডটি। কিন্তু কী কারণে সুলতান মামুদের পর দেড়শো বছর থেমে গিয়েছিল ভারতের মাটিতে ইসলামের অভিযান? আজ আমরা সেই ইতিহাসের অধ্যায়টি খুঁজে বের করি। ঠিকানা বর্তমান উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলা। মধ্যযুগের কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, এখানে ছিল 'ভার' বংশের রাজধানী এবং তা থেকেই একে 'ভারাইচ' নামে ডাকা হতো। বর্তমানে এর নাম— 'বাহরাইচ।' পুরাণ অনুসারে, রামপুত্র লব এবং পরে রাজা প্রসেনজিৎ বাহরাইচের শাসক ছিলেন। এটি ব্রহ্মার রাজধানী হিসেবেও পরিচিত। এছাড়া আদিকবি বাল্মীকি ও ঋষি বালার্ক এখানে থাকতেন। মহাভারতের অজ্ঞাতবাসকালে মাতা কুন্তি-সহ পঞ্চপাণ্ডব এখানে কিছুকাল ছিলেন। বর্তমান বাহরাইচ হলো উত্তর প্রদেশের দেবীপাটন বিভাগের একটি জেলা।

১০৩০ খ্রিস্টাব্দে গজনির সুতলান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে দেশে ফিরে মারা যাবার পর ভারতে তার ভাইপোর নেতৃত্বে পরের বছরই আরেকটি ইসলামিক অভিযান হয়েছিল। ভাইপোর নাম সৈয়দ সালার মাসুদ গাজি। কাকার চেয়ে নৃশংসতায় কিছুমাত্র কম ছিল না ভাইপো। কাকার সোমনাথ মন্দির লুঠের সময় ভাইপো সামনে থেকে দেখেছিল সে দৃশ্য। ১৬ বছর বয়সে সালার মাসুদ সিন্ধু নদ পেরিয়ে ভারতে ঢোকে এবং একে একে জিতে নেয় মুলতান, দিল্লি, মীরাট এবং শেষে সাত্রিক। এই সাত্রিকে সে তৈরি করে সদর দপ্তর। এরপর এখান থেকেই একের পর এক অভিযান করে স্থানীয় রাজাদের বিরুদ্ধে। দিল্লির রাজা মহীপাল তোমর আগেই পরাজিত হয়েছিলেন। মীরাটের রাজা হরি দত্ত হেরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। এরপর বুলন্দশহর থেকে বাদাউন হয়ে সালার মাসুদ পৌঁছল কনৌজ। কনৌজের রাজাও প্রচুর ধনরত্ন মাসুদকে দিয়ে শত্রুকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন পূর্ব ভারতের দিকে। এবার অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে ভারাইচ রাজ্যে পাঠানো হলো সৈয়দ সৈফুদ্দিন ও মিয়ান রজভকে। ইতিমধ্যে ভারাইচ-সহ এই এলাকার হিন্দু রাজারা গড়ে তুলেছেন একটি

জোটশক্তি। কিন্তু সালার মাসুদের বাবা গাজি সালার সাহুর কাছে পরাজিত হলেন তাঁরা। তবুও তাঁরা মাসুদ বাহিনীকে রীতিমতো ভয়ে রেখেছিলেন।

আর সে কারণে ১০৩৩ খ্রিস্টাব্দে সালার মাসুদ নিজে ভারাইচে আসে সবকিছু নিজের চোখে দেখতে। মাসুদ বাহিনী পরাজিত রাজাদের ফের পরাজিত করতে থাকে। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসে শ্রাবস্তীর রাজা অসম সাহসী বীরযোদ্ধা সুহেলদেব। লখিমপুর, সীতাপুর, বারাবাঁকি, উন্নাও, ফৈজাবাদ, ভারাইচ, শ্রাবস্তী, গোণ্ডা প্রভৃতি ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি ছিল রাজা সুহেলদেবের অধীনে। রাজা সুহেলদেব ছিলেন একাধারে গোরক্ষক, প্রজাপালক এবং সাধুসন্তসেবক। সালার মাসুদ যুদ্ধক্ষেত্রে সামনের সারিতে গোরু বেঁধে রেখে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, রাজা সুহেলদেব গোবধ করবেন না এবং সেই সুযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে। কিন্তু সুহেলদেব খবর পেয়ে যুদ্ধের আগের দিন রাতেই সব গোরুগুলোর বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দু' পক্ষের মধ্যে শুরু হলো তুমুল লড়াই। একদিকে বিশাল মাসুদ বাহিনী এবং অন্যদিকে স্বদেশ রক্ষার কঠোর ব্রতে উদ্বুদ্ধ রাজা সুহেলদেবের মুষ্টিমেয় সেনাদল। দেশভক্তির কাছে হার মানলো আক্রমণকারী বিধর্মীবাহিনী।

রাজা সুহেলদেবের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে নিহত হলো সালার মাসুদ। সময়টা ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দ। এই যুদ্ধ 'ভারাইচের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ভারাইচের মাটিতেই কবর দেওয়া হলো তাকে। পরবর্তীকালে দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুঘলক সেখানে একটি দরগাহ তৈরি করে। জানা যায়, ওই জায়গায় ছিল ঋষি বালার্কের আশ্রম। ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার কানিংহাম রাজা সুহেলদেবের একটি বংশতালিকা তৈরি করেছেন। সেটি হলো :

(১) ময়ূরধ্বজ (৯০০ খ্রি:), (২) হংসধ্বজ (৯২৫ খ্রি:), (৩) মকরধ্বজ (৯৫০ খ্রি:), (৪) সুধন্যধ্বজ (৯৭৫ খ্রি:) এবং (৫) সুহৃদলধ্বজ বা সুহেলদেব (১০০০ খ্রি:)। শ্রাবস্তীর রাজা মকরধ্বজের বড়ো ছেলে ছিলেন এই রাজা সুহেলদেব। অনেক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি, যেমন— শকরদেব, সুহৃদ্যধ্বজ, সুহৃদিল, সুহৃদিলধ্বজ, রাজা সুহৃদদেব, সুসাজ, সুহার্দল, সুহৃলদার, সহরদেব, সুহরদেও, সুহালদেব, সুহিলদেব, সুহেলদেব ও সুহেলদেও।

রাজা সুহেলদেব ও সালার মাসুদের বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফার্সি ভাষায় লেখা 'মিরাট-ই-মাসুদি' গ্রন্থে। লেখক— আবিদ-উর্-রহমান চিস্তি, যিনি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি:) সময়কার মানুষ। 'মিরাট-ই- মাসুদি' অনুসারে, রাজা সুহেলদেব ছিলেন 'ভড় থারু' সম্প্রদায়ের মানুষ।

তবে কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ভড় রাজপুত। কেউ বলেন রাজ ভড়। কেউ বলেন,; থারু। কারও মতে তিনি বৈস রাজপুত। কারও মতে, পাণ্ডববংশীয় তোমর। কেউ বলেন, জৈন রাজপুত। আবার কেউ, ভড় শিব, থারু কলহন, নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়, বিষেণ ক্ষত্রিয়, কারও মতে অবার কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন রাজা সুহেলদেব। তবে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গুরুসহায় দীক্ষিত ধ্বংজদীন নামে ভারাইচের এক স্কুল শিক্ষক রাজা সুহেলদেবকে জৈন হিসেবে উল্লেখ করে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'শ্রীসুহাল ভবানী।' অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই কবিতাটি এলাকার সভা-সমিতিতে পাঠ করা হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৫০ সালে কবিতাটি ছাপা হয়। আর্য সমাজ, রামরাজ্য পরিষদ এবং হিন্দু মহাসভার তরফে ১৯৫০ সালের এপ্রিলে সালার মাসুদের দরগাহর সামনে রাজা সুহেলদেবের স্মরণে একটি মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দরগাহ কমিটির সদস্য খাজা খলিল আহমেদ শা 'কম্যুনাল টেনশন'-এর কারণ দেখিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মেলা বন্ধের আবেদন জানান। জারি হয় ১৪৪ ধারা। স্থানীয় হিন্দুরা এর প্রতিবাদে সরব হন এবং এক সপ্তাহ এলাকার দোকান-পাট, বাজার বন্ধ থাকে। দু' হাজার মানুষ জেলে যান। গঠিত হয় 'সুহেলদেব স্মারক সমিতি।'

প্রয়াগপুরের রাজপরিবার সমিতিকে দান করেন ছিত্তোরা লেক-সহ পাঁচশো বিঘে জমি। ওই জমিতেই তৈরি হয় সুহেলদেবের মন্দির। এবার শুরু হয় স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সুহেলদেবকে নিয়ে ভোটব্যাংকের রাজনীতি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সুহেলদেবকে দলিত পাসি সম্প্রদায়ের রাজা বলে ভোটব্যাংক তৈরি করতে আসরে নামে। এ কাজে প্রথম নামে বহুজন সমাজ পার্টি। পরে ২০০২ সালে গড়ে ওঠে 'সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি।' ২০১৮ সালে ভারতের ডাক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মহারাজ সুহেলদেবের স্মরণে এক ডাকটিকিট।

পরিশেষে বলা যায়, এই রাজা সুহেলদেবের কারণেই গজনির সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর মহম্মদ ঘোরির আসতে সময় লেগেছিল দেড়শো বছর। গুপ্ত রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত দুর্ধর্ষ হূণদের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ শানিয়েছিলেন যার জন্য গুপ্তশাসনের পর বহুদিন পর্যন্ত তারা আর ভারত আক্রমণ করতে সাহস করেনি। তেমনি উত্তর ভারতের শ্রাবস্তীর রাজা সুহেলদেবের হাতে সালার মাসুদের নিহত হবার দেড়শো বছর পর্যন্ত এদেশে ইসলামি আক্রমণ ঘটেনি। এর কৃতিত্ব রাজা সুহেলদেবের। তথাকথিত ঐতিহাসিকদের চাপা দেওয়া ইতিহাসের পাতায় না থাকলেও স্থানীয় মানুষের মনে, লোকগাথায় আজও অম্লান রাজা সুহেলদেবের বীরত্বগাথা। তিনি যে প্রকৃতই বীর! ▯

নেতাজীকে বাঁচাতে স্বামীকে হত্যা করেছিলেন নীরা আর্য

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বীরাঙ্গনা নীরা আর্য ছিলেন একজন অসম সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী। অথচ তাঁর কথা দেশের বেশিরভাগ মানুষই জানে না, কারণ ইতিহাস সেভাবেই লেখা হয়েছে। নীরা আর্য ছিলেন একজন অবিস্মরণীয় বিজয়িনী বীর, আজাদ হিন্দ ফৌজে রানি ঝাঁসি বাহিনীর সৈনিক। তাঁকে ব্রিটিশ সরকার সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত করেছিল। তাঁকে চর বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

১৯০২ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ইউনাইটেড প্রভিন্সের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) বাঘপত জেলার খেকড়া নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেঠ ছাজুমল ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মা মারা গেলে ছাজুমল মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় নীরা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সেই সময়ে তিনি ইংরেজি ছাড়াও বাংলা ও আরও কয়েকটি ভাষা জানতেন। শৈশব থেকেই তিনি ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে উৎসাহী ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরীসীম।

তাঁর বাবা শেঠ ছাজুমল তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডিতে কর্মরত একজন তদন্ত আধিকারিক শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাসের সঙ্গে নীরার বিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে নীরা আর্য আইএনএ-র রানি ঝাঁসিবাহিনীর সদস্যা হয়ে গেছেন। তখন তিনি নীরাকে বলেছিলেন, নেতাজীকে গুপ্তহত্যা করতে। তিনি যখন তা করতে অস্বীকৃত হলেন তাঁর স্বামী নীরাকে সন্দেহ করে তার ওপর নজরদারি শুরু করে। তিনি নীরাকে সুভাষচন্দ্রের হদিশ দিতে বললে নীরা তাতেও অসম্মত হন। এর পর তাঁর স্বামী খুব অল্প সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হদিশ পেয়ে যান। শ্রীকান্ত রিভলভার থেকে নেতাজীর উপর গুলি চালান। এতে সুভাষচন্দ্র বসুর ড্রাইভার আহত হন, নেতাজী প্রাণে বেঁচে যান।

নীরা একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর স্বামীকে ছুরি মেরে হত্যা করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনহানির চেষ্টার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। যখন লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বন্দি করে এনে বিচার চলছিল তখন অন্য বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হলেও স্বামী হত্যার দায়ে তাঁকে আন্দামানে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়। আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাবাসের সময় নীরা আর্যকে প্রতিদিনই নির্যাতন করা

হতো। তিনি তাঁর কারাবাসের সেই বেদনাদায়ক গল্প শুনিয়েছিলেন।

সমুদ্রের মাঝখানে এক অচেনা দ্বীপে তাঁকে রাখা হয়েছিল। তিনি শুরুতে ভাবতে লাগলেন এখন কীভাবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেবেন। তাঁর মতো অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য মহিলা বন্দিরাও ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে শাস্তি ভোগ করতেন রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পরোয়া না করে তাঁকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল কয়েক মাস ধরে; তিনি একটি কম্বলও পাননি।

অবশেষে একদিন মধ্যরাতে দুই প্রহরী তাঁর কামরায় আসে এবং তারা তাঁর উপর কম্বল ছুঁড়ে দেয়। প্রথমে তাঁর এতে খারাপ লাগলে কিন্তু পরে তিনি নরম হলেন, কারণ খুব কনকনে ঠাণ্ডা ছিল আর সেই সময়ে কম্বলটা খুব দরকার ছিল। কিন্তু তবুও তাঁর যন্ত্রণার উপশম হলো না, কারণ তাঁর গলা, হাত ও পা শক্ত লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল।

পরের দিন একজন কামার তার কুঠরিতে এলো। সে নীরা আর্যর হাতের শিকল কেটে ফেলতে আরম্ভ করল। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সে নীরার হাত থেকে কিছুটা মাংস কেটে ফেলেছিল। নীরা তা উপেক্ষা করলেন, কিন্তু যখন সেই কামার তাঁর পায়ের থেকে শিকল কেটে ফেলতে শুরু করল তখন একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে নীরার হাড়ে দু'তিনবার আঘাত করল। নীরা ব্যথায় কাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ স্বরে তাকে বললেন, 'তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ? তুমি আমার পায়ে দু-তিনবার আঘাত করলে?' সেই হাতুড়ির আঘাতে তিনি দারুণ ব্যথা পেয়েছিলেন। কামার বলল, 'আমি তোমার বুকে আঘাত

করলেও তুমি কিছুই করতে পারবে না'। নীরা জানতেন যে তিনি সেখানে একজন বন্দি বই কিছু নয়। তারা যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে এবং তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেতাই আচরণ করতে পারে। তিনি রেগে গিয়ে তার গায়ে থুথু দিলেন এবং তাকে বললেন, 'মহিলাদের সম্মান করতে শিখুন।'

জেলার সাহেব তার কাছে এসে ঘটনাটা শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় আছে যদি তুমি আমাদের বলতে পার তবে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি'। তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন, 'নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আর সবাই সেকথা জানেন'। জেলার সাহেব জবাবে বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, কারণ সুভাষ চন্দ্র বসু এখনও বেঁচে আছেন। তারপর জেলার সাহেব আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, 'নেতাজী কোথায়?' নীরা আর্য রাগে উত্তর দিল, 'তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার হৃদয়ে আছেন'।

জেলার সাহেব কড়া গলায় বলল, যদি নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর হৃদয়ে বাস করেন, তাহলে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দিন।' জেলার তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করল এবং সমস্ত জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলে কামারকে তাঁর স্তনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। কামার ধারালো সাঁড়াশি দিয়ে স্তনে চাপ দিতে লাগল, যন্ত্রণার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেল। জেলার তাঁর ঘাড় চেপে ধরে বলল তিনি যদি কখনো কারও সঙ্গে তর্ক করেন তবে তাঁর অন্য স্তনটাও কেটে ফেলা হবে। জেলার সাহেব তারপরে তাকে সেখানে পড়ে থাকা একটা চিমটে দিয়ে আঘাত করে বলল যে আমাদের রানি ভিক্টোরিয়াকে ধন্যবাদ জানাই যে এই সাঁড়াশি ব্যবহার করা হলো না।

নীরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অবদান রেখেছেন, যে আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁকে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল সেভাবে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর তিনি হায়দরাবাদে ফুল বিক্রি করে জীবনযাপন করতেন। ১৯৯৮ সালে ২৬ জুলাই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আমাদের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতার জন্য তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবগত নয়।

আমরা অকৃতজ্ঞ হলেও চিত্রপরিচালক বিশাল ত্যাগী 'নীরা আর্য : নাগিন কী আত্মকথা' গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র তৈরি করছেন। খেকড়ার কন্যাকে নিয়ে তৈরি এই ফিল্মের জন্য খেকড়ানিবাসী খুব উৎসাহী। ▯

সস্তার মোহে চীনাপণ্য ক্রয় ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করারই নামান্তর

অম্লান কুসুম ঘোষ

সাধারণ ভারতীয় ক্রেতা সস্তার মোহে পড়ে ভারতীয় পণ্যের বদলে চীনা পণ্য কিনে ফেলেন আর এর মাধ্যমেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে প্রতিবছর চীনে চলে যায়। গত অর্থবর্ষে চীনের সঙ্গে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০.৮ বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার ন'শো কুড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা হলো চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি এবং মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হলো ভারত থেকে চীনে হওয়া রপ্তানি। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি হলো ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২০ কোটি টাকা।

ভারতে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে চীন ভারতের সঙ্গেই শত্রুতা করছে। ভারতে ব্যবসা করে চীন যে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি লাভ করছে সেই অর্থের দ্বারা চীন নিজের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উন্নত করছে। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করছে এবং সেই অত্যাধুনিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের সীমান্তে হামলা করছে।

চীন যে শুধুমাত্র ভারতের সীমান্তেরই ক্ষতি করছে তা নয় তার অর্থবল এবং অস্ত্রবল ভারতের অভ্যন্তরেও নিয়মিত প্রযুক্ত হচ্ছে ভারতের ক্ষতি সাধনের জন্য। মূলত কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ভারতের প্রায় আশিটি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হতো। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চীনের বাজার নষ্ট হবে এবং চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে চীন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়। চীনের লক্ষ্য ভারতকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে রেখে দেওয়া, ঠিক ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশের মতো। বস্তুত পলাশীর যুদ্ধের আগের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের সঙ্গে আজকের চীনের কার্যপদ্ধতির অদ্ভুত সাদৃশ্য।

চীনা পণ্যের ব্যবহারের ফলে ভারতের অর্থনীতি ঠিক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ চীনা পণ্যের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসমূহের বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য বাজার হারাচ্ছে। ফলে ভারতীয় শিল্প চাহিদার অভাবে ভুগছে। চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। কুটিরশিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বৃহৎশিল্পগুলি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। কুটিরশিল্পের শিল্পী এবং বৃহৎশিল্পের শ্রমিক উভয়ই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। তাদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা দুইই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতির অন্য দুই ক্ষেত্র কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাসের হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনরায় উৎপাদন হ্রাস ঘটে। সেই সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি বেকারত্ব, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, পুনরায় বেকারত্ব— এইরূপ পতনের এক চক্রে প্রবেশ করে।

গত আর্থিক বছরে চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি হলো ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা। এই আমদানি

ফঃ ৫

কাঁচামাল হিসেবে হয় না, পুরোটাই হয় নির্মিত বস্তু হিসেবে। এই বিপুল পরিমাণ নির্মিত বস্তু ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়ায় ভারতীয় শিল্পসামগ্রী এই পরিমাণ বাজার হারালো বা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের বছরে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকার চাহিদা হ্রাস হলো। ভারতীয় শিল্পী ও শ্রমিকদের ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস হলো। শিল্পক্ষেত্রে হওয়া এই বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব কিন্তু শুধু শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পী ও শ্রমিকরা উপার্জনহীন হওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে বলে তারা কৃষিপণ্য কম কিনতে পারছে। কৃষিপণ্যের চাহিদাও হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন হ্রাস ও ফলস্বরূপ কৃষকদের উপার্জন হ্রাস ঘটছে। এই পরোক্ষ ক্ষতি হওয়া ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতিরও সম্মুখীন হচ্ছে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র। কারণ চীনে তৈরি নকল চাল, নকল ডিমের মতো অনেক জিনিস ভারতের বাজারে ছেয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখে জিনিসগুলিকে ক্রেতারা আসলের থেকে আলাদা করতে পারেন না। এগুলি শরীরের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। এইসব জিনিস তারা কিনে ফেলেন, ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রও বাজার হারায়।

নকল চাল ও নকল ডিমের মতো সামগ্রী চোরাপথে অনথিভুক্ত অবস্থায় বাজারে প্রবেশ করে। তাই এইসব সামগ্রী বাজারে কত পরিমাণে বিক্রি হলো এবং তার ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র প্রত্যক্ষ ভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস ঘটেছে মোট ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকার। বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতিতে যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়। চীনা পণ্যের জন্য শিল্পক্ষেত্রের যে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস ঘটছে তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ বছরে ১.৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকার (৪.৫৭৩২০ × ৪০/১০০) কৃষিপণ্যের বিক্রয় হ্রাস ঘটছে। কৃষক সমাজের বছরে ১.৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন হ্রাস ঘটছে। এই উপার্জন হ্রাসের ফলে আবার পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রয় তথা চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

কারণ যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ যেমন কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয় সেরকমই যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড়ো অংশ শিল্পজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে ১.৮২৯২৮ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাসের ফলে পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রি বা চাহিদা হ্রাস পেল ৬৪০২৪৮ লক্ষ কোটি টাকা (১.৮২৯২৮ × ৩৫/১০০)। শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক ও শিল্পীদের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন-হ্রাস ঘটলো। এই উপার্জন হ্রাসের পর্বে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে বেকারত্ব ও কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন হ্রাস পুনরায় কৃষিক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাসের কারণ হয় এবং কৃষিক্ষেত্রের সেই উপার্জন হ্রাস পুনরায় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাসের কারণ হয়। এভাবেই পরোক্ষভাবে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেরই ক্রমান্বয়ে উপার্জন হ্রাস ঘটতে থাকে।

শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র মিলিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির মোট পরিমাণ হলো (৪.৫৭৩২০ + ১.৮২৯২৮ + .৬৪০২৪৮) ৭.০৪২৭২৮ লক্ষ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র উপার্জন হ্রাসের শিকার হলে তার প্রাথমিক পরোক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর। যে কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড়ো অংশ পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে সার্বিক ব্যয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্র যখন ৭.০৪২৭২৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন হ্রাসের শিকার হচ্ছে। তখন ভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রও (৭.০৪২৭২৮ × ১৫/১০০) ১.০৫৬৪০৯২ লক্ষ কোটি টাকার চাহিদা হ্রাসের ফলে সমপরিমাণ অর্থের উপার্জন হ্রাসের সম্মুখীন হয়। পরিষেবা ক্ষেত্র এই পরিমাণ উপার্জন হ্রাসের শিকার হলে তার প্রাথমিক পরোক্ষ প্রভাব পড়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের ওপর। পরিষেবা ক্ষেত্রে ১.০৫৬৪০৯২ লক্ষ কোটি টাকা (১.০৫৬৪০৯২) × (৩৫+৪০)/(১০০)। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন হ্রাস আবার পরোক্ষভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস এবং তার ফলে পুনরায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস, উপার্জন হ্রাসের পূর্বোল্লিখিত চক্রের দর্শন এক্ষেত্রেও দেখা যায়।

চীনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি হচ্ছে (৪.৫৭৩২০ + ১.৮২৯২৮ + .৬৪০২৪৮ + ১.০৫৬৪০৯২ + .৭৯২৩০৬৯) ৮.৮৯১৪৪৪১ লক্ষ কোটি টাকা। সীমাহীন পুনঃ পরোক্ষ ক্ষতি তো পরিমাণের অতীত কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বর নিয়মানুসারে চলতি বছরে হওয়া পুনঃ পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয় প্রত্যক্ষ ক্ষতির ৫০ শতাংশ। চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের জন্য এক বছরে হওয়া পুনঃ পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ৪.৪৪৫৭২২০৫ (৮.৮৯১৪৪৪১ × ৫০/১০০) লক্ষ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও পুনঃ পরোক্ষ মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৩.৩৩৭১৬৬১৫ (৪.৪৪৫৭২২০৫ + ৮.৮৯১৪৪৪১) লক্ষ কোটি টাকা বা ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা।

এই অর্থ আমাদের এক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমান। এই অর্থ আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক খরচের তেত্রিশ গুণ; স্বাস্থ্যখাতে বার্ষিক খরচের সাঁইত্রিশ গুণ; সামরিক খাতে বার্ষিক খরচের সাড়ে পাঁচ গুণ। শুধুমাত্র সস্তার মোহে পড়ে চীনা জিনিস কিনে আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ চীনের হাতে তুলে দিচ্ছি তা দিয়ে তেত্রিশ বছর ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যয় বহন করা যেত। সাঁইত্রিশ বছর ধরে দেশের স্বাস্থ্য খাতে হওয়া যাবতীয় সামগ্রিক ব্যয় বহন করা যেত। সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ সাড়ে পাঁচ গুণ বাড়ানো যেত। যার ফলে সামরিক খাতে সাড়ে পাঁচ গুণ বলে বলীয়ান হয়ে আমরা সামরিক দিক দিয়ে গোটা বিশ্বে অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারতাম। এছাড়াও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৭ কোটি টাকায় এগারো কোটি লোকের কর্মসংস্থান হতো। এবং তাদের প্রত্যেকের মাসে ১০০০০ টাকা করে বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উপার্জন হতে পারতো কিন্তু এসব কিছু হচ্ছে না শুধুমাত্র আমরা সস্তার মোহে পড়ে চীনা দ্রব্য কিনছি বলে।

এছাড়াও চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আরও কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথমত, চীনা দ্রব্যগুলি ইউজ অ্যান্ড থ্রো

পদ্ধতির হওয়ায় পুরনো জিনিস সারাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কর্মচ্যুত হয়। মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্র হওয়ায় এই কর্মচ্যুতির সাংখ্যিক হিসেব সম্ভব নয়। কিন্তু বিশাল সংখ্যক নিম্নবিত্ত ভারতবাসী যে এর ফলে বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ হয় তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, বশংপরম্পরায় চলে আসা বহু হস্তশিল্প যেগুলি শুধু ভারতের গৌরবই নয় বরং বহির্ভারতের ভারতের পরিচয়জ্ঞাপক। (যেমন— বেনারসি শাড়ি, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশের কাজ, টেরাকোটার কাজ প্রভৃতি) হস্তশিল্পগুলির হুবহু নকল চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেছে। ফলে সেই হস্তশিল্পগুলি বাজার হারাচ্ছে এবং হতাশ হয়ে শিল্পীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ ভারতের গৌরব হিসেবে পরিচিত সেই হস্তশিল্পগুলি চিরতরে লোপ পেতে চলেছে। এককালে ব্রিটিশের অত্যাচারে যেমন ঢাকাই মসলিন বন্ধ হয়ে গেছিল, হয়তো একালে চৈনিক অত্যাচারে আরও অনেক হস্তশিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্ষতির এখানেই শেষ নয়। দেশের অর্থনীতির ভয়ংকর অবস্থা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। বিশ্লেষণে দেখা যায় চীনা পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়। কারণ চীনা পণ্যগুলি উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ভারতের বাজারে পাঠানো হয়। চীনা পণ্যগুলি ভারতে পাঠানো হয় সাময়িকভাবে ক্ষতি স্বীকার করে। সাময়িক ভাবে এই ক্ষতি স্বীকারের পেছনে থাকে এক দীর্ঘমেয়াদি দুরভিসন্ধি। চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ভারতীয় কারখানাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া। কুটীর শিল্পের শিল্পীরাও অভ্যাসের অভাবে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা হারাবে। ভারতবর্ষ তখন বন্ধ শিল্পের এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। ভারতীয় ক্রেতারা তখন সম্পূর্ণরূপে চীনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেই সময়ে ভারতীয় বাজারের ওপর সেই একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নেবে চীন। তখন তারা যে দাম দেবে ভারতীয় ক্রেতাদের সেই দামেই কিনতে হবে চীনের সামগ্রী। অর্থনীতির পরিভাষায় এই অপকৌশলকে বলা হয় ডাম্পিং। এই ডাম্পিঙের চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ যদি অবিলম্বে রোধ করা না যায় তাহলে দেশের যে দুরবস্থা হবে, অনাগত সেই ভয়ংকর ভবিষ্যত যেন কল্পনাকেও হার মানাবে।

গোটাদেশের কী ক্ষতি হবে তা তো দেখা গেল। রাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গও এই ক্ষতির শিকার হবে। কিন্তু বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে বেশি, রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পগুলি আগেই বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের উপার্জনের সবেধন নীলমণি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি চীনা সস্তা পণ্যের আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে মূলত ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক দ্রব্যের উৎপাদনকারী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই। পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের সামনে তাই বেকারত্বের হাতছানি বড়ো প্রকট। এছাড়াও চীনের সস্তা লেড আলো বিপদে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পীদের। চীনের সফট টয় বিপদে ফেলেছে এখানকার খেলনা নির্মাণকারী কুটিরশিল্পীদের। পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পীরাও তাই আজ বড়ো বিপদাপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পের মধ্যে টিম টিম করে টিকে থাকা একমাত্র শিল্প পাটশিল্পও আজ বিপদের মুখে। চীনের তৈরি বিভিন্ন সস্তা বিকল্প, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের নাভিশ্বাস তুলছে। দেশের মধ্যে সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদেও ন্যূন। একথা অনস্বীকার্য, যে চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসনে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ আর তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

সেদিনের ভারতবাসী যেমন ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করেছিল সে ভাবেই আমরা যদি চীনা পণ্য বয়কট করতে পারি, যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারি চীনা দ্রব্য কিনবো না, তবেই চীনের আগ্রাসনকে দমন করতে পারবো।

চীনাদ্রব্য ব্যবহারের ফলে হওয়া ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনীতির সীমানায় আবদ্ধ নেই। পরিবেশও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ এসব চীনা পণ্য সাধারণত ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয়, বরং ব্যবহারের পরে ফেলে দেবার পরও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিশে যায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয় এবং এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

তাহলে সমাধান কোথায়? সমাধান আছে। ভারতবিরোধী সব কাজই চীন করছে এবং করবে আমাদের দেশে বিক্রীত চীনা পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকেই। তাই জনসাধারণ যদি চীনের পণ্য না কেনেন অর্থাৎ চীনের পণ্য বয়কট করেন তাহলে চীন অর্থাভাবে ভারতবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। কোনো পণ্য কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে। ক্রেতারা যদি চীনা পণ্য না কেনে, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহ চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শুধুমাত্র ভারতীয়রা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করতে শুরু করতেই টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের। বাধ্য হয়েছিল তারা পশ্চাদপদসরণ করতে। সেদিন দরিদ্র পরাধীন অস্ত্রহীন ভারতবাসী যা করতে পেরেছিল আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের পঞ্চম এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের সপ্তম শক্তিধর দেশের নাগরিক ভারতবাসী আমরা কি তা করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো, যদি সেদিনের মতো আজও আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি। সেদিনের ভারতবাসী যেমনভাবে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করেছিল সেরকম ভাবেই আমরাও যদি চীনা পণ্য বয়কট করতে পারি, যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারি একটিও চীনা দ্রব্য কিনবো না। তবেই আমরা চীনের আগ্রাসনকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারবো। □

গোরুর দুধে সোনার নেপথ্যে অরিফেরাস প্লান্ট

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গোরুর দুধে কী সোনা আছে? 'হ্যাঁ আছে', দৃপ্ত উত্তর গোয়ালার স্নাতকোত্তর পাঠরতা মেয়ে রাধার। 'বিজ্ঞানের যে যুক্তিতে কীটনাশক-দুষ্ট বিজ্ঞানীরা আর গোখাদ্য খেয়ে গোরুর দুধে কীটনাশকের অবশেষ (Residual Toxicity) জমে এবং বামপন্থী বিজ্ঞানীরা তা বারবার সচেতন করে দেন, সেই একই যুক্তিতে গোরুর দুধের মধ্যে মাটির কণায় রয়ে যাওয়া কমবেশি সূক্ষ্ম পরিমাণ সোনা Auriferous plants-এর মাধ্যমে গোরুর শরীরে প্রবেশ করাও অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় মানুষের দেহে সোনা জমার সম্ভাবনাও। গোয়ালা সমাজে একটি প্রবাদ আছে, 'গাভীর মুখে দুধ'; শহুরেবাবুরা হেসেই কুটিপাটি হয় এ কথা শুনে। এর অর্থ শহর ধরতে পারেনি, তাদের চিরাচরিত দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদ দিয়ে। গোরু যেমন খাবে, তেমনই তার দুধের গুণগত ও পরিমাণগত মান হবে। গোরু যে 'মুখে দুধ' দেয়, তা গ্রাম জানে, শহর জানে না, শহরের সেকুলার রাজনীতিবিদরা তো জানেই না।'

রাধা আরও জানালো, 'ভারতের নানান অঞ্চলের লোকসমাজ জানে, কোন ফসল, কোন ফার্নালিস খাওয়ালে গোরুর দুধে সোনা বাড়ে। অপেক্ষা করুন, আসন্ন জৈব-ভারত (India in Organic Farming)-এ দেশিয় গোরুকে পরিমাণমতো ভেষজগুণ-সম্পন্ন গোখাদ্য খাইয়ে Medicinal Milk তৈরি করবো এবং তার বিশ্ববাণিজ্যও করবে গোয়ালা সমাজ। যারা যত্রতত্র গোরুর দুধে

'সোনা' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তারাই কাজের মেয়েকে পাঠিয়ে মেডিসিনাল মিল্ক আগে কিনবেন, হলফ করে বলতে পারি। যেমন করোনা পরিস্থিতিতে গোপনে গোমূত্র খেয়েছেন অনেকে বাঁচার অদম্য আগ্রহ নিয়ে।'

এবার জিজ্ঞাসা করলাম রাধাকে, কথায় এত বলিষ্ঠতা এলো কীভাবে? 'সে এক বামা মাস্টারের গল্প! তিনিই তখন 'সরকার', এ তল্লাট শাসন করে বেড়ান। সদলবলে মর্নিংওয়াক করতে এসে দুধ নিয়ে যেতেন। এসেই চারপাশে ছুটোছুটি, আর সে কী হম্বিতম্বি। গোরুকে কী খাওয়াচ্ছি, কতটা খাওয়াচ্ছি, ফসলে কীটনাশক দিচ্ছি কিনা, দুধের বালতিতে গোপনে জল নিয়ে দুইতে যাচ্ছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতেন, 'পেস্টিসাইড স্প্রে করা ফসল গোরুকে খাওয়াবি না, মনে থাকে যেন।' তিনিই শেখালেন, 'জানিস, পেস্টিসাইড এখানকার জমিতে স্প্রে করলে কুমেরুবৃত্তে পেঙ্গুইনে তার অবশেষ পাওয়া যাবে।' তারপর একদিন বামা মাস্টারের ক্ষমতা গেল, তবুও বৃদ্ধ জ্যাঠামশাইয়ের মতো নব্যদের নিয়ে জনৈক রাজনৈতিক নেতাকে ভেংচি কেটে বলতেন, 'ওঃ শালা, দুধে সোনা' আমি শুধু তাকে একবার বলেছিলাম, যে যুক্তিতে কীটনাশক-দুষ্ট খাবার খেয়ে গোরুর দুধে পেস্টিসাইডের Residual Toxicity হয়, একই যুক্তিতে Auriferous plants খেয়ে গোরুর দুধে সোনা পাওয়া যাবে না কেন? আপনার কাছে কী নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে, কোন ফসল-খাইয়ে কত পিপিএম, কত পিপিবি সোনা মজুত আছে? পুষ্টিকর দুধ সেবন করতে হলে দেশি গোরু নিয়েও গবেষণা করতে হয়। কোন ব্রীডের কী বৈশিষ্ট্য জানতে হয়।'

তারপর কী বলো! ...'চাড্ডির মেয়ে', 'হাড্ডির মেয়ে', 'গোবর-খেকো', 'গোমুত-খেকো' বলে সে কী গালাগাল। হ্যাঁ, আমরা গোবর-গোমুত খাই, কিন্তু উদ্ভিদকে পরম আদরে জৈবসার হিসেবে খাইয়ে, তার ফসলরূপ প্রসাদ। তবে হ্যাঁ, গোরুর সংখ্যা যেভাবে কমছে, গ্রাম-ভিত্তিক ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার পক্ষে একান্তই আতঙ্কের।' রাধাকে শুধু বললাম, আশার কথা এটাই, 'শ্রদ্ধেয় গান্ধীজী গোবরকে বলেছেন 'সোনা সার', আর গোমূত্রকে 'রাজা সার'।' এবার গান্ধীগিরি করতে হবে। আপাতত রাজনৈতিক তর্জাটা সোনা সার আর রাজা সার'-এ পৌঁছাক। সিকিমের মতো পশ্চিমবঙ্গকে Organic Farming State ঘোষণা করা হলে, তবেই গোরুর সংখ্যা বাড়বে। সাধারণ মানুষ চান, রাজ্যে 'অপারেশন ফ্লাড/হোয়াইট রেভোলিউশন' হোক। কারণ 'ধান ধন বড়ো ধন/আর ধন গাই/সোনারূপা কিছু কিছু/আর সব ছাই।'

প্রান্তিক পড়ুয়াদের নতুন দিগন্ত চেনাচ্ছে ‘পৃথিবীর পাঠশালা’

বিশেষ প্রতিনিধি।। কারও বাবা রিকশা চালান, কেউ করেন দিন মজুরি। কারও বাবা সুতোকলের শ্রমিক তো কারও মা তৈরি করেন ঠোঙা। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলো এভাবেই কোনও রকমে বেঁচেবর্তে ছিল। তার মধ্যেও বাড়ির ছেলেমেয়েরা চালিয়ে যেত পড়াশোনা। কিন্তু বাদ সাধলো পৃথিবীজুড়ে চলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। লকডাউনের বেড়াজালে আটকে ছাপোষা সংসারে তখন রুজিরুটির সংশয়। পড়াশোনা তো দূর অস্ত। সেই তখনই একদল তরুণ-তরুণী ছোটন, রাজীব, অপু, সুরভীদের হতদরিদ্র পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেয়। কলকাতার একদল ছাত্র-যুবকের মিলিত প্রয়াসে তৈরি হয় কোয়ারানটাইন স্টুডেন্টস ইয়ুথ নেটওয়ার্ক। তাদেরই উদ্যমে শুরু হয় ‘পৃথিবীর পাঠশালা’। করোনাকালে শহরের বস্তি ও গ্রামের প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের সবরকম সাহায্য করার পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে অন্যভাবে পৃথিবীকে চেনানোর চেষ্টা।

কোয়ারানটাইন স্টুডেন্টস ইয়ুথ নেটওয়ার্ক শুরুটা করেছিল লকডাউনের সময়ে কলকাতার আনাচেকানাচে বস্তিগুলোয় অনাহারে থাকা মানুষগুলোর জন্য দুবেলা দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু সেখানেই আটকে থাকেনি তাদের সেবাকাজ। খাদ্য সমস্যার সমাধানের পরেই তাঁদের মাথায় আসে শিক্ষার কথা। হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য দুবেলা পেট পুরে খাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে লকডাউনের সময় স্কুল বন্ধ থাকায় যখন অনলাইন পড়াশোনার চল শুরু হলো, তখন চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা পড়ুয়াদের কাছে মোবাইল ফোনটাই তো নেই। তাঁদের পড়াশোনার কী হবে? কোয়ারানটাইন স্টুডেন্টস ইয়ুথ নেটওয়ার্ক-এর সদস্যদের সম্মিলিত চিন্তা থেকেই জন্ম নিল ‘পৃথিবীর পাঠশালা’।

কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বর্তমান পড়ুয়াদের এই সংস্থাটি

আপাতত রাজ্যের ১৭ টি জায়গায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পঠনপাঠন চালাতে উদ্যোগী হয়েছে। পৃথিবীর পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা স্বাগত চক্রবর্তী জানান, ‘‘পড়াশোনা তো শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে না। আমরা সারাদিনের অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু শিখি, তাকেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। এই পৃথিবীই তো আমাদের পাঠশালা।’’ বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে শুরু হয় পৃথিবীর পাঠশালার প্রথম স্কুল। করোনার বাধা পেরিয়ে, চারপাশ স্বাভাবিক হওয়ার পর কলকাতার ঠাকুরপুকুর, দমদম, কলেজ স্ট্রিট, বাঘাযতীন ছাড়াও আলিপুরে একটি, হুগলীর আরামবাগে দুটি, হাওড়ার পাঁচলা ও বাউড়িয়ায়, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে, অশোকনগর ও হাবড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, সোনাখালি ও বালিদ্বীপে পৃথিবীর পাঠশালা খোলা হয়েছে। প্রান্তিক পড়ুয়াদের ক্লাসের পাঠ্যক্রমের জন্য বই, ড্রইং খাতা, গল্পের বই ইত্যাদি জোগাড় করা হচ্ছে। পাঠশালার কাজকর্মকে যাতে আরও প্রাণবন্ত ও কার্যকর করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে অভিজ্ঞদের সঙ্গে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে, মাঝে মধ্যেই কলকাতা ও আশেপাশের জেলার কিছু স্কুলে শিক্ষামূলক শিবির করা হতো। সবচেয়ে বেশি যাওয়া হতো সুন্দরবনের দিকে। শিবিরে কখনও প্রকৃতি নিয়ে অডিয়ো-ভিডিয়ো, কখনও বা বিজ্ঞানের নানা বিষয় হাতে-কলমে করে দেখানো হতো। প্রচার চালানো হতো কুপ্রথা বিরুদ্ধে। এর ফলে পড়ুয়ারা ঠিক কী জানছে এবং কী বুঝছে তার একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। সেইমতোই পড়ুয়াদের চাহিদা অনুসারে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে পৃথিবীর পাঠশালার।

অন্যতম উদ্যোক্তা সৈকত শিট বলেন, ‘দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা এই সব পড়ুয়ার শৈশব নানান সমস্যায় জর্জরিত থাকে। আমরা ওদের সঙ্গী হতে চাইছি।’ ছোটো ছোটো দল গড়ে কোয়ারানটাইন স্টুডেন্টস ইয়ুথ নেটওয়ার্কের সদস্যরাই এখানে পড়ান। তার পাশাপাশি খেলা, কার্টুন চ্যানেল, মহাকাশবিজ্ঞান, ডিসকভারি চ্যানেল— সবকিছু নিয়েই চলে আলোচনা। আম্ফান ঝড়ের পর একদিন সুন্দরবন লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগণার একটি গ্রামে গিয়ে ৮০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়ার দেখা পান নেটওয়ার্কের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের রেশনের ব্যবস্থা হয়। তারপর সেখানেও শুরু হয় পৃথিবীর পাঠশালা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কোথাও কোনও বাড়ির ছাদে, তো কোথাও ক্লাবঘরে। দু-একটি জায়গায় ইট-বালি-টিন-কাঠ কিনে খাড়া করা হয়েছে একচিলতে পাঠশালা। এই কাজে তাঁরা সহযোগিতা পেয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের। এগিয়ে এসেছেন আরও অনেক পরিচিত। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

মা

যতীনের তেরো বছর বয়স। কারমাইল কনভেন্ট স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। প্রতিদিন সে পুলকারে স্কুলে যায়। খুবই মেধাবী। শিক্ষকদের খুব প্রিয়পাত্র। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে মা তাকে বড়ো করছে। মায়ের ইচ্ছা যতীন বড়ো হয়ে আইএএস অফিসার হবে। মায়ের আশা পূরণ করার জন্য যতীনও খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করে। প্রতি বছর স্কুল ম্যাগাজিনে তার লেখা ছাপা হয়। খেলা, ভাষণ, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। বার্ষিক পরীক্ষা-সহ সবকিছুতেই সে প্রথম হয়ে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে। পুরস্কার বিতরণের দিন যতীনের মা স্কুলে গেলে শিক্ষকমশাইরা মঞ্চে ডেকে নেন। তখন যতীনেরও খুব গর্ব অনুভব হয়।

যতীনের বাবা সেনাবাহিনীতে সুবেদার ছিলেন। কাশ্মীরে সীমান্ত প্রহরার সময় শত্রুর গুলিতে তিনি প্রাণ বলিদান করেছেন। তখন থেকে মা-ই যতীনকে আগলে রেখেছে। মায়ের স্নেহে বাবার অভাব কোনোদিন বুঝতে পারেনি। যতীন মায়ের একমাত্র অবলম্বন।

বেশ কিছুদিন থেকে মা লক্ষ্য করছে যতীনের মুখ ভার। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করছে না। বিকেলে খেলতেও যাচ্ছে না। আগে যেমন মন দিয়ে পড়াশোনা করতে তেমন করছে না। মা কিছু বললেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করছে। এসব দেখে মায়ের মন খুব ব্যাকুল হয়ে গেল।

একদিন মা তাকে বলল, কী হয়েছে বাবা! সবসময় মন খারাপ করে থাক কেন ? আজ তো তোমার খুশি থাকার কথা। কাল তুমি স্কুলে আবার পুরস্কার পাবে। এবারও তুনি প্রথম স্থান অধিকার করে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ। কাল আমি স্কুলে গেলে আবার আমাকে শিক্ষকমশাইরা মঞ্চে ডেকে নেবেন। আবার তোমার বুক গর্বে আনন্দে ভরে উঠবে।

একথা শুনেই যতীন মায়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল— না, কাল তুমি আমার স্কুলে যাবে না। তোমার কারণেই আমার মন খারাপ। স্কুলে তোমাকে দেখে আমার বন্ধুরা আমাকে অপমান করে। আমার বন্ধুর মায়েরা কত সুন্দর, আর তুমি? তুমি কী ভীষণ কুৎসিত!

এটুকু শুনেই মা জোরে কেঁদে উঠল। মাকে ডুকরে কাঁদতে দেখে যতীনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা তুমি কাঁদছ কেন? মা তোমার কী হয়েছে? বলো মা! মা শুধু কেঁদেই চলেছে।

মা কিছু বলছে না দেখে যতীন বলে উঠল, বলো মা, আমার দিব্যি, তোমার কী হয়েছে? ছেলের দিব্যি শুনে মা বলল, তখন তুমি মাত্র তিনমাসের। তোমার বাবা তখন কাশ্মীর সীমান্তে। কালীপূজার দিন ছিল। চারিদিকে বাজি ফাটছে। হঠাৎ একটা বাজি এসে আমাদের খড়ের চালে পড়ল। ঘরে আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে সারা বাড়ি জ্বলতে লাগল। তুমি তখন ঘরের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলে। তোমাকে বাঁচানোর জন্য কেউ ছিল না বাবা। আমি তখন সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে বের করে নিয়ে আসি আর তাতেই আমার সারা শরীর পুড়ে গিয়েছে।

তাই আমি এত কুৎসিত হয়ে গিয়েছি বাবা! আমিও তোমার বন্ধুর মায়েদের মতোই ছিলাম। ... মা আবার ডুকরে কেঁদে উঠল। যতীনও ডুকরে কেঁদে উঠল। মায়ের চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা। আমি বুঝতে পারিনি। বন্ধুদের অপমানে আমার মন ছিল না। তুমি আমার সুন্দর মা। তোমার থেকে সুন্দর মা আর কারও নেই। আমি পড়েছি, ভগবানের পরে মা-ই সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু তুমি তো ভগবানের চাইতেও বড়ো। আজ থেকে আমি ভগবানের আগে তোমাকেই পূজা করবো।

যতীন কাঁদতে লাগল। মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল আর দুজনে দুজনের চোখের জল মুছে দিতে লাগল।

নীরজ শাস্ত্রী

ভারতের বিপ্লবী

হিমাংশুমোহন বসু

বিপ্লবী হিমাংশুমোহন বসুর জন্ম ১৯০৬ সালে ঢাকার মুন্সিগঞ্জে। স্কুল জীবনেই যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে কলকাতায় এসে তাদের বাড়িতেই থাকতেন। ১৯৩০ সালে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে তিনি গ্রেপ্তার হন। পুলিশ তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি সি মিঃ হ্যানসন স্বীকারোক্তি ও গোপন সংবাদ জানার জন্য তাঁর বুকে বুটের পদাঘাত করে। কোনোরকম গোপন খবর আদায় করতে না পেরে নির্মমভাবে আঘাত করে। তারপর মুমূর্ষু অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। আহত অবস্থায় এই বীর বিপ্লবীর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বিশ্বকবি বলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- তাঁকে গানের রাজা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
- এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া তাঁর চিঠির সংখ্যা ৪২০০।
- বিখ্যাত 'রবীন্দ্র-জীবনী'র লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।
- মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।
- রাজা রামমোহন রায়কে 'ভারতপথিক' আখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভালো কথা

ভুলু আর লালি

আমাদের ভুলুর বংশপরিচয় কেউ জানে না। বাবা এক বছর আগে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। এখন এক বছর বয়স। বাড়ির এঁটোকাঁটা খায় আর গোয়ালের দরজায় ঘুমোয়। লালিকেও বাবা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। ওর বয়স ছ'মাস। লালি বাবার সঙ্গে বিছানায় ঘুমোয়। ভুলু আর লালি দুজনের মধ্যে খুব ভাব। লালি ধেড়ে ইঁদুর ধরতে পারে না। নেংটিগুলো ধরে খায়। ধেড়ে দেখলেই তাড়া করে। লালির তাড়া খেয়ে উঠোনে এলেই ভুলু গোঁ করে একটা শব্দ করে ধরে ফেলে। তারপর লালিকে দেয়। লালি ওটাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে পেটপুরে খায়। ভুলু আর লালির জন্য আমাদের বাড়িতে এখন আর ইঁদুরের উৎপাত নেই। এখন লালি পাশের বাড়িতে গিয়ে ধেড়ে তাড়া করে বাইরে আনে আর ভুলু গপ্ করে ধরে লালিকে দেয়। এখন শীতের সময় ভুলু আর লালি রোদে একসঙ্গে শুয়ে থাকে।

পূর্ণিমা চক্রবর্তী, একাদশ শ্রেণী, রাণাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ধা হি রা ক

(২) পা ন ল চাঁ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) স্য স হা হা রি প

(২) খ ং দ সু স বা

১৪ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অকালপক্ক (২) অজাতশত্রু

১৪ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অক্ষরপরিচয় (২) অক্ষরজ্ঞানহীন

উত্তরদাতার নাম

(১) অভিজিৎ দাঁ, ১৯ কেষ্টদাস পাল লেন, কল-৬। (২) শ্রেয়শী ঘোষ,ঠাকুরদাস বাবু লেন, ই বি, মালদা।

(২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (৩) শুভজিৎ দাঁ, টি পি রোড, কলকাতা-৬

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

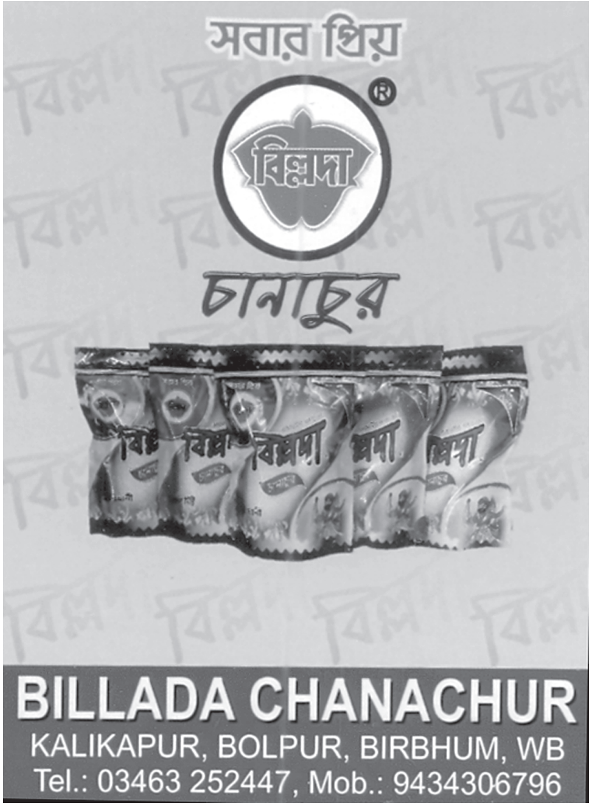

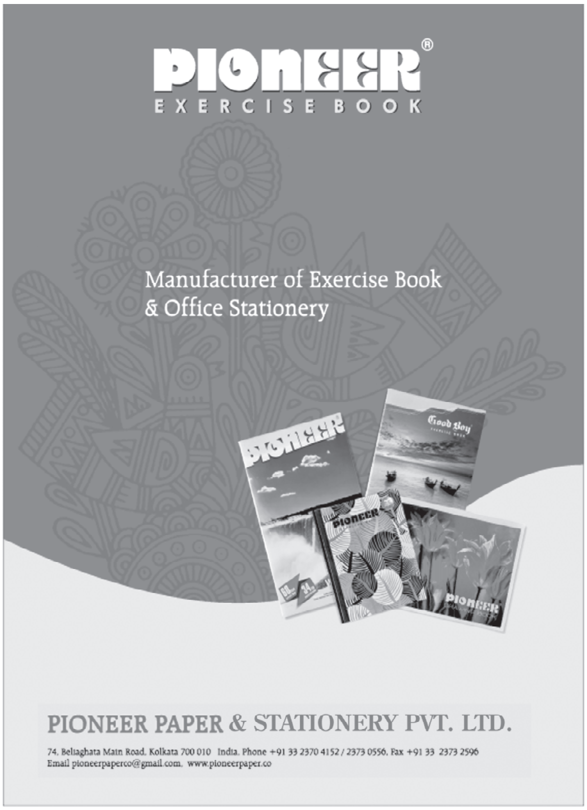

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মিসিং লিংক

ইতিহাসের কিংবদন্তী কিংবা কিংবদন্তীর ইতিহাস

সন্দীপ চক্রবর্তী

শ্রীরাম ঐতিহাসিক পুরুষ নাকি কিংবদন্তী— এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, একজন কবি যখন কাল্পনিক কোনও চরিত্র নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেন তখন তিনি কাব্যগুণের উৎকর্ষের প্রতিই বেশি নজর দেন। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, সমুদ্রবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। অথচ রামায়ণ লিখতে গিয়ে বাল্মীকি তাই করেছেন। এটা প্রমাণ করে রামায়ণ শ্রীরামের আত্মজীবনী, নিছক মহাকাব্য নয়। সেই কারণেই বাল্মীকি তাঁর নায়কের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সবরকম প্রমাণ একজায়গায় জড়ো করেছেন।

রামায়ণে বাল্মীকি যেসব জায়গার বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে শ্রীরাম বনবাসকালে যেসব জায়গায় ছিলেন— সেইসব জায়গার প্রকৃতি, আবহাওয়া— এমনকী নামটি পর্যন্ত অবিকৃত রয়ে গেছে। বাল্মীকির অসাধারণ ভূগোলজ্ঞানের কয়েকটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। বনবাসের জন্য যাত্রা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে তমসা নদীর (মান্তা) তীরে এলেন। তারপর গোমতী নদী পেরিয়ে সরযূ নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন। এরপর তাঁরা কোশল দেশের সীমা পেরিয়ে শৃঙ্গবেরপুরে (শ্রীগ্রাউর) এলেন। শৃঙ্গবেরপুরের রাজা তখন নিষাদরাজ গুহ। শ্রীরামের পরের গন্তব্য চিত্রকূট। জায়গাটা উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের সীমায়। এখানে শ্রীরামের থাকার স্মৃতি এখনও বহন করছে এখানকার বাল্মীকি আশ্রম, মাণ্ডব্য আশ্রম, ভরত কূপ ইত্যাদি। এখানেই শ্রীরামের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। পাদুকা নিয়ে ভরত চলে যাবার পর শ্রীরাম ঋষি অত্রির আশ্রমে (সাতানা, মধ্যপ্রদেশ) চলে যান। তারপর বর্তমান ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ঘুরে দণ্ডকবনে পৌঁছন। এটি বর্তমানে সাতানায়। এখানে ছিল সরভাঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম। এখানে শ্রীরাম দীর্ঘকাল ছিলেন। সাতানার পর নাসিক। এখানকার পঞ্চবটী অরণ্যে বাস করেছিলেন শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ। এখানেই লক্ষ্মণের সঙ্গে সূর্পণখার দেখা হয় এবং এখানেই খর ও দুষণের সঙ্গে শ্রীরামের যুদ্ধ হয়। মৃগব্যাধেশ্বর ও বাণেশ্বর কাছাকাছি দুটি জায়গা। এখানে সোনার হরিণের ছদ্মবেশধারী মারীচ নিহত হয়। শ্রীরাম যেখানে-যেখানে গেছেন বাল্মীকি তার এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় প্রতিটি জায়গায় তিনি সশরীরে গেছেন, থেকেছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্যানুসন্ধান পরোক্ষে রামায়ণের ঐতিহাসিকতাকেই প্রমাণ করে।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ চার দাঁত বিশিষ্ট হাতি। বাল্মীকির রামায়ণে রয়েছে লঙ্কাদ্বীপে রাবণের প্রাসাদ পাহারা দিত চার দাঁত বিশিষ্ট হাতি। বলাবাহুল্য, চার দাঁতের হাতি এখনকার হাতির তুলনায় সাইজে দ্বিগুণ, শক্তি, হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতাও সাংঘাতিক। এখন প্রশ্ন হলো, চার দাঁত বিশিষ্ট হাতিরা পৃথিবীতে ছিল মোটামুটি ১২০-১.৬০ লক্ষ বছর আগে। বাল্মীকির ভাষ্য অনুযায়ী রামায়ণের ঘটনা ঘটেছিল ত্রেতাযুগে অর্থাৎ ১০ লক্ষ বছর আগে। ত্রেতাযুগের সময়সীমা ৩,৬০০ × ৩৬০ বছর বা ১২,৯৬,০০০ বছর। অথচ রামায়ণে বর্ণিত তিথি ও নক্ষত্রবিন্যাসের হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে শ্রীরামের জন্ম হয়েছিল ৫,১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এটা কীভাবে সম্ভব? কেউ কেউ বলেন ৫,১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যে ঘটনা ঘটার আভাস আমরা পাচ্ছি সেইরকমই ঘটনা ১০ লক্ষ বছর আগেও ঘটে থাকবে। এই নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

যে বিশাল হস্তীবাহিনী রাবণের প্রাসাদ পাহারা দিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেরো

ফুট লম্বা স্টেগোডন (stegodon)। সাধারণভাবে মনে করা হয় ১১,০০০ বছর আগেই স্টেগোডন লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ভারতে স্টেগোডনের অস্তিত্ব ছিল। ভারতে তাম্রযুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত স্টেগোডন ভারতে ছিল বলে গবেষকেরা দাবি করেছেন। হিমাচল প্রদেশের শিবালিক ফসিল পার্কে এরকম এক স্টেগোডনের ফসিল দেখতে পাওয়া যায়। লেখক-গবেষক নীলেশ ওক লিখেছেন রামায়ণের ঘটনাবলী সর্বশেষ হিমযুগের (হ্যালোসিন) শেষদিকে হয়েছিল। নীলেশ কেন একথা বলছেন সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

জিওলজিক, প্যালিও-ক্লাইমেটিক ও ওশিয়ানোগ্রাফিক তথ্য অনুযায়ী ১২,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ শেষ হিমযুগের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বরফ গলার কারণে ভয়াবহ প্লাবন দেখা গিয়েছিল। ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের গভীরতা হয়েছিল ৮০ মিটার। ২০১১ সালে এই তথ্য দিয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশিয়ানোগ্রাফির প্যালিও-ক্লাইমেট প্রোজেক্টের প্রধান ড. রাজীব নিগম। হিমযুগের শেষে বরফগলার ফলে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। আবার পুরাণ বলছে শ্রীরামের পূর্বপুরুষেরা শিবালিক গ্লেসিয়ারের জল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক খালবিল নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর ফলে উপকৃত হয়েছিল পঞ্জাব ও রাজস্থান অঞ্চল। প্লাবনের ফলে ভারতের নদ-নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল এবং মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রীরামের জন্ম সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার অনেক আগে। এর কারণ গুজরাটের লোথাল বন্দর সংলগ্ন সমুদ্রের গভীরতা। হিমযুগ শেষ হবার পর (রামায়ণের সময়) আরব সাগরের গভীরতা ছিল ৮০ মিটার। এখন থেকে ৬০০০-৪০০০ বছর আগে সমুদ্রের গভীরতা কমে যায়। এর ফলে বন্দরটি পরিত্যক্ত হয়। মহাভারত অনুযায়ী মোটামুটি এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজধানী দ্বারকার নির্মাণ করান। শ্রীরাম যখন সেনা নিয়ে রামেশ্বরমে পৌঁছন তখন সমুদ্রের গভীরতা এখনকার থেকে তিন মিটার কম ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই রামসেতু নির্মিত হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন মিটার নীচে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে রামসেতু প্রাকৃতিক হলেও এর ওপরের অংশ মানুষের তৈরি। গাছের গুঁড়ি এবং ছোটোবড়ো পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেতু। দৈর্ঘ্য ৩০ কিলোমিটার। দ্যা ইন্ডিয়ান মিনিস্ট্রি অব আর্থ সায়েন্সের গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, রামসেতুর কোনও কোনও অংশে টেরি ফর্মেশন পাওয়া গেছে, যা প্রচুর মেসোলিথিক ও সাইক্রোলিথিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রমাণ করে। এটাও বোঝা যায় এখন থেকে ৯০০০-৮০০০ বছর আগে এই অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক মানুষের বসবাস ছিল।

প্রাচীন ভারতের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী হিমযুগের কারণে দক্ষিণ ভারতের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছিল। বস্তুত তামিলনাড়ুতে প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্যবসতির এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে যা ইন্দোনেশিয়ার তোবা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের যে সময়কাল তার থেকেও প্রাচীন। তোবার ভলক্যানিক অ্যাশ বিশ্লেষণ করে বিস্ফোরণের সময় নির্ণয় করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন থেকে ৬০,০০০ বছর আগে তোবায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ভারতের মাটিতে প্রথম মনুষ্য বসবাস দক্ষিণে শুরু হয়েছিল বলে মনে করেন পুরাতাত্ত্বিকেরা। দক্ষিণ থেকে গিয়ে তারা উত্তর ভারতের হিমালয় সংলগ্ন নদ-নদী বহুল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অনুমান করা হয় ১২,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অনেক পরে দক্ষিণ থেকে উত্তরের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই হিসেবে রাবণ প্রাচীন ভারতীয় কোনও পরিবারের মানুষ।

হ্যালোসিন কালপর্বের প্রথম পাঁচ হাজার বছর সমুদ্রের জলস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে অনেক গ্রাম ও শহর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য মানুষের সলিল সমাধি হয়। যারা অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পালাতে পেরেছিলেন তারাই শেষপর্যন্ত বেঁচে যান। এই প্লাবনের যে উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে রয়েছে সেখানে কুমারীখণ্ডম নামে এক তলিয়ে যাওয়া ভূখণ্ডের কথাও পাওয়া যায়। কুমারীখণ্ডম দক্ষিণ ভারতের ভূখণ্ড। অনেকে এর সঙ্গে কিংবদন্তী লেমুরিয়ারও তুলনা করেন। আরব সাগরের খামবাট উপসাগরের তলদেশে যে প্রাচীন তামিল সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে তা ৮,০০০ বছরের পুরনো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তামিল সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে বর্তমান শ্রীলঙ্কার পশ্চিমে, ভারত মহাসাগরের নীচে। এখানেই প্রাচীন পাণ্ড্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পাণ্ড্য বংশের রাজারা হারিয়ে যাওয়া কুমারীখণ্ডম শাসন করতেন বলে দাবি করা হয়। এই দাবি মেনে নিলে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে পাণ্ড্য রাজারা অবশ্যই ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে কুমারীখণ্ডম শাসন করতেন।

রামায়ণে এমন অনেক কিছুর বর্ণনা রয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃতিক— এমনকী অনেকসময় আজগুবি বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীরামের সেনাবাহিনীতে বানরদের অংশগ্রহণের কথা বলা যেতে পারে। বানরেরা কীভাবে যুদ্ধ করতে পারে? এ প্রসঙ্গে গ্রিক পর্যটক তেসিয়াসের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বানরদের মধ্য ভারতের পিগমি বলে বর্ণনা করেছেন। এই বানরেরা ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সব থেকে বড়ো কথা, বানরেরা ছিল পেশাদার যোদ্ধা। তারা বিভিন্ন রাজার হয়ে যুদ্ধ করত বলে লিখে গেছেন তেগিয়াস। রামায়ণের আর একটি বিস্ময়কর উপাদান রাবণের পুষ্পক বিমান। সরোজ বালা ও কুলভূষণ মিশ্র তাঁদের 'হিস্টরিসিটি অব বেদিক অ্যান্ড রামায়ণা এরা' গ্রন্থে পুষ্পক বিমান সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন রাবণ ও রাক্ষস সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশের হিমযুগ-পরবর্তী জনগোষ্ঠীর অংশ। এরা ছিলেন কন্যাকুমারীর সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া ভূখণ্ডের (কুমারীখণ্ডম) শাসক। এই রাক্ষস সম্প্রদায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যথেষ্টই অগ্রসর ছিল। কিন্তু প্লাবনের ফলে সেই জ্ঞান আজ অবলুপ্ত।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। তবে যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীরাম কাল্পনিক চরিত্র নয়। কোনও কাল্পনিক চরিত্র কিছুতেই হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষের মনে থেকে যেতে পারে না। এমনকী তাকে দেবত্বের টনিক খাওয়ালেও সেই ভেজাল সময়ের দাঁড়িপাল্লায় ঠিকই ধরা পড়ে।

আমার দেখা চার বলিদানীর ত্রিপুরা

শ্যামলী বসু

মার্চ মাসের প্রথমদিকে এক ছুটির দিনে আমরা বাড়ির সবাই একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছি। তার মধ্যে আমার হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা আমরা যদি, মানে আমি ও আমার স্বামী অজিত বসু দুর্গাপূজার পর ত্রিপুরা, গৌহাটি ও শিলং যাই তাহলে কেমন হয়! সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলে শৌভিক বলে উঠল— ঠিক আছে; তাহলে প্লেনে যাও প্লেনে এসো এবং এটাও বলল পূজার পর কেন আগস্টের ৫ তারিখ যাও তাহলে ছোটোমামুদের (দিনেন্দ্রনাথ দে) ওই ৬ আগস্ট স্মরণসভাতে থাকতে পারবে। কিন্তু ওই সময় আমি অফিস থেকে ছুটি পাব না।

তারপর সঙ্ঘের এক কার্যকর্তা শম্ভুদা, (প্রচারক বিজয় আঢ্যর ছোটো ভগ্নীপতি) এবং আর এক কার্যকর্তা অজয়দা ত্রিপুরা যাচ্ছি শুনে বলল— আমরাও যাব। পরদিন টিকিট কাটা হয়েও গেল। ১০ অক্টোবর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়ে মহারাজা বীর বিক্রম বাহাদুর (আগরতলা) বিমানবন্দরে এবং পরে১৬ অক্টোবর গৌহাটি থেকে ফেরা।

এরপর আমি হঠাৎই একদিন বলরামদাকে (পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ) বলে ফেললাম, আমরা ত্রিপুরা যাচ্ছি। শুনে তো তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, বলো কী? কারণ, গত ২১ বছরে যতবার আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রত্যেকবারই তিনি আমাদের একবার ত্রিপুরা ঘুরে আসতে বলেছেন। কারণ সকলেই জানেন যে ৬ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে, সেই সময়কার ধলাই জেলার, কাঞ্চনছরা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস থেকে চারজন কার্যকর্তাকে এনএলএফটি জঙ্গিরা অপহরণ করেছিল। তাঁদের নাম শ্যামল কান্তি সেনগুপ্ত, দিনেনন্দ্রনাথ দে, সুধাময় দত্ত ও কাঞ্চন চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ দে ছিলেন আমার নিজের ছোড়দা, যদিও আমি তাঁকে মেজদা বলেই ডাকতাম। আর সুধাময়দার সঙ্গে কিছুদিন আগেই একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল, সদা হাস্যময় সেই মুখ আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের যাওয়ার কথা শুনে বলরামদাও ওইদিন টিকিট কেটেছেন শুনলাম।

দেখতে দেখতে ১০ অক্টোবর এসে গেল এবং আমরা চারজন রওনা দিলাম। আর আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তা কোনোদিন ভুলব না— যত্নসহকারে মনের মধ্যে রেখে দেব। নেমেই দেখি সদা হাস্যময় কানুদা (প্রচারক, প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য) একগাল হাসি নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে রয়েছেন বিদ্যার্থী পরিষদের বিস্তারক ভাস্করদা। মনে হলো সেই তো নিজের জায়গায় এসে পড়লাম।

বিমানবন্দর থেকে সেবাধাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার পথে কানুদা ওই চারজন প্রচারকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম। তার মধ্যে তাঁর একটি কথা আমি কোনোদিন ভুলব না— ওরা চারজন প্রচারক নিয়ে গেছে, আমি এই

সেবাধামে প্রতিবেদক ও প্রচারক কানুলাল মালাকার।

ঝোলায় চল্লিশজন প্রচারক ভরব। এর মধ্যে ২৭ জন এখনও পর্যন্ত প্রচারক বেরিয়েছেন ত্রিপুরা থেকে।

যাইহোক, ধীরে ধীরে কানুদাও বুঝে গেলেন, আমিও তাঁর মতো কথা বলতে ভালোবাসি। সেবাধাম ঢোকার সময় কানুদা একটি মিষ্টির বাক্স আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা বলরামদার হাতে দিয়ে দিতে। কিন্তু কেন দেব, কার মিষ্টি তা কিছুতেই বললেন না। কথামতো বলরামদার হাতে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে বললাম কানুদা দিতে বলেছেন, এর বেশি কিছু আমি জানি না। বিজয়ার পর কোথাও গেলে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়, তাই সেই মিষ্টি বলরামদা সেবা কেন্দ্রের সব দাদা-ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

পরদিন ১১ অক্টোবর ২০২২-এ ভোরবেলা কানুদা বলরামদা এবং আমরা সবাই চললাম ত্রিপুরেশ্বরী মা-কে দর্শন করতে, তার আগে সেবাধামের মহাদেবকে ঘণ্টা বাজিয়ে ধূপ দেখিয়ে ও নীলকণ্ঠ ফুল দিয়ে পুজো করে গেলাম। আমরা খুব সুন্দর ভাবে পুজো দিলাম, দর্শন করলাম এবং কিছুক্ষণ নাটমন্দিরে বসলাম। এর মধ্যেই দেখি অনেকে এসে গেছে। তার মধ্যে সোনাই, অরুণাংশু, সুরজিত। এর মধ্যে সোনাই তো আমায় নিজের পিসির আসনে বসিয়ে দিল। মনে হলো আমি ওর কতদিনের চেনা। কথা বলতে বলতে ওরা মেজদার (দিনেনদা) কথা বলতে লাগল। দিনেনদা যখন ওখানে থাকত ওরা তখন সব ছোটো ছোটো। দিনেনদা ওদের পড়াশুনার খোঁজ নিতেন, অঙ্ক করাতেন, মাঠে খেলাতেন আরও কত কী! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে শুনতে ওদের সঙ্গে চললাম। যেতে যেতে একটি শিব মন্দির দেখতে পেলাম, বাবার কাছে এসে ধূপ প্রদীপ দেব না একি হয়! সোনাই বলল, দাড়াও পিসি, আমি এনে দিচ্ছি— এই বলে দৌড়ে গিয়ে ধূপ প্রদীপ আনল, আমায় দিল ও নিজে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। দেখে মনটা ভরে উঠল।

বলরামদা প্রথম যখন ত্রিপুরাতে আসেন প্রচারক হিসেবে, শিব মন্দির সংলগ্ন যে মাঠে শাখা হতো সেটাও দেখলাম। এরপর অরুণাংশু, সোনাই ও আমাদের নিয়ে সুরজিত নিজের গাড়িতে উঠল, নিয়ে চলল উদয়পুর কার্যালয়ে। কার্যালয় থেকে বেরিয়ে দেখি ওরা ওখানে একটি হল ভাড়া করেছে আর আশেপাশের সব দাদা, ভাই ও কিছু দিদিও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা পৌঁছাতেই এক বর্ষীয়ান কার্যকর্তা আমাদেরও মঞ্চের ওপর বসিয়ে দিলেন, আরেক বর্ষীয়ান কার্যকর্তা অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। প্রথমেই আমাদের হাতে মা ত্রিপুরেশ্বরীর ফোটো তুলে দিলেন এবং সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই অভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার একটাই কথা বার বার মনে হচ্ছিল, এতদিন কেন আসিনি? মন গুমরে উঠছিল বার বার যে দিনেনদাকে, শুভঙ্করদাকে এত মনের গভীরে স্থান দিয়েছেন এখানকার মানুষ। প্রথম যিনি কার্যকর্তা তাঁদের সম্বন্ধে বলছিলেন, তাঁর প্রত্যেক কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁদের প্রতি আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আমাকেও একটু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ করে মেজদা সম্বন্ধে কিছু বলার।

দিনেন্দ্রনাথ দে, মানে গনদা, আমার মেজদার কথা লিখতে গিয়ে চোখে জল আসছে। যারা যারা তাঁদের সম্বন্ধে বললেন প্রত্যেকের কথার মধ্যে দিয়ে মনে হলো তাঁরা মেজদাকে আমার থেকেও হয়তো বেশি ভালো চিনতেন, এমনকী মাছের মুড়ো খাওয়ার গল্পও তাঁরা বললেন। এইসব শুনে আমি বললাম, দিনেনদা আমার দাদা, রক্তের সম্পর্কের দাদা, কিন্তু তিনি এখানকার সকলের দাদা, আপন দাদা। প্রত্যেকটা মানুষ মেজদাকে যে এত ভালোবাসে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রয়াত কার্যকর্তা পলুদার বাড়িতে। আমি তো গিয়েই মাসিমার সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তাঁর এক মেয়ে আমার মেজদার কথা বলতে লাগলেন। ওর ভাই যখন ছোটো ছিল, মেজদা বাড়ি এলেই ওর দুষ্টুমির কথা, পড়াশোনার কথা বলতেন। মেজদা নাকি মাঝে মাঝেই ওর ভাইকে নিবাসে নিয়ে যেত, পড়াশোনা করাত, গল্প বলত, তারপর ৩-৪ দিন পর আবার বাড়ি দিয়ে আসত। আমি মনোযোগ দিয়ে সেসব গল্পও শুনছি আর মনে মনে ভাবছি, মেজদা বাড়িতে এলেও আমায় এই ভাবে গল্পের মাধ্যমে শাসন করত।

একবার মনে আছে আমি তখন দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ি, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছিলাম, মেজদা সেদিন বাড়িতে এসেছিল। আমি বাড়িতে আসতেই মা, বউদি জিজ্ঞেস করল এত দেরি কেন? আমি আমতা আমতা করছি, মেজদার দিকে তাকিয়ে মিথ্যেও বলতে পারছি না। কারণ, মেজদার চোখ দুটো খুব বড়ো বড়ো লাগছিল। বলেছিলাম আমি বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছিলাম। তারপর মেজদা আমার হাত দুটো ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় বসিয়ে বলল, তুই অনেকক্ষণ কিছু খাসনি। তারপর মাকে ডেকে বলল ওকে আগে কিছু খেতে দাও। আমি খাচ্ছি, মেজদা আমার পাশে বসে জিজ্ঞসা করল, কী সিনেমা দেখলি? গল্পটা বল শুনি? আমি বাধ্য হলাম গল্পটা বলতে, কিন্তু যে সিনেমা ছিল তা মেজদাকে না বলার মতো। যাইহোক, সেইদিন থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বাড়িতে না জানিয়ে আর কোথাও যাব না। এই ছিল আমার মেজদা— দিনেনদা।

তারপর উদয়পুর থেকে আমরা চলে এলাম ত্রিপুরা রাজবাড়ি দেখতে। মিউজিয়াম ও আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে চলে এলাম আগরতলা কার্যালয়ে। ওখানেও দেখি অনেকে একত্রিত হয়েছেন। সেবিকা সমিতির অনেক দিদি, রিঙ্কুদি, দীপঙ্করদার স্ত্রী-সহ সঙ্ঘের অনেক কার্যকর্তা। আমরা কেউই জানতাম না আমাদের জন্যে এতকিছু আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন গৌতমদা। বলেছিলেন তাঁর

পড়াশোনার কথা, তাঁর ব্যবহারের কথা। ওখানে মেজদা সব স্বয়ংসেবকদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের খবর নিতেন তাদের অঙ্কে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, বিজ্ঞানে অসুবিধা হচ্ছে কিনা কিংবা ইতিহাস, ভূগোলে অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। গৌতমদা বলছিলেন, দিনেনদা যে ঠিক কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন তা তারা বুঝতে পারতেন না, কারণ সব বিষয়ে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। আমায় যখন কিছু বলতে বলা হলো, অনেক কিছুর মধ্যে আমি এটাও বলেছিলাম যে, শুধু রক্তের সম্পর্কেই সম্পর্ক হয় না, আত্মার সম্পর্কেও সম্পর্ক হয়। কারণ যেভাবে আগরতলার মানুষজন তাঁকে মনে রেখেছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। এটাই বোধহয় সঙ্ঘ পরিবার। এই সঙ্ঘ পরিবারের মধ্য দিয়ে আমরাও কেশবজীকে সেভাবে মনে রেখেছি। কিছুদিন আগে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। শেষে বলরামদা ছোটো বড়ো সবার জন্য কিছু কথা বলে কার্যক্রম শেষ করলেন। এরপর আমরা বিজয়ার মিষ্টি মুখ করে সঙ্ঘ কার্যালয়েই রাতের ভোজন সেরে সেবাধাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দিকে রওনা দিলাম।

পরদিন (১২.১০.২২) সকালে কানুদা আবার আমাদের গাড়িতে নিয়ে গেলেন আগরতলা, রেলপথে ধর্মনগর। ট্রেনপথ— পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুবই মনোরম দৃশ্য। ধর্মনগর পৌঁছে দেখি অনেক স্বয়ংসেবকের ভিড়। ওখানে আবার সবাই শুভঙ্করদার খুব ভক্ত। এরপর ধর্মনগর নিবাসে স্বল্পাহার করে, সবার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সেরে আমরা গাড়ি নিয়ে চললাম কাঞ্চনছরা ছাত্রাবাসের দিকে, যেখান থেকে চার কার্যকর্তাকে এনএলএফটি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে। যাওয়ার পথে বলরামদা কত কথা বলতে লাগলেন, আগে নাকি এই কাঞ্চনছরা শুধুই জঙ্গল ছিল, কার্যকর্তাদেরও গাড়ি নাকি পুলিশ পাহারায় যেতে হতো। গা ছমছম করা পরিবেশ। আমি শুধুই ওঁদের কথা ভাবতে লাগলাম, মনটা ভারী হয়ে এল। ছাত্রাবাসে পৌঁছে যে জায়গা থেকে অপহরণ করা হয়েছে, আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে, প্রার্থনাঘর তিনবার প্রদক্ষিণ করলাম আর সবার আড়ালে কেঁদে চললাম। ওখানকার মাটি মাথায় ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম তোমরা যেখানেই থাক ভালো থেকো, আমাদেরও আশীর্বাদ কর।

এরপর ওখান থেকে আমরা চলে এলাম কুমারহাট। ওখানেও দেখি একটি অনুষ্ঠান বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে এবং অনেক স্বয়ংসেবক ভাই, দাদা-দিদিরা উপস্থিত হয়েছেন। ওখানে কার্যক্রম পরিচালনা করলেন পান্নাদা। খুব মিশুকে মানুষ তিনি। প্রথমেই মেজদার বয়েসি এক কার্যকর্তা তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন, তারপর আমাকে কিছু বলতে বলা হলো। পারলাম না বেশি কিছু বলতে, মন ভীষণ ভারাক্রান্ত ছিল। শেষে বলরামদা তাঁদের কিছু কথা ও সঙ্ঘের কাজ কীভাবে আরও বিস্তার করা যায় সেই বলে কার্যক্রম শেষ করলেন। এক কার্যকর্তা কাঁদতে কাঁদতে মেজদার সঙ্গে তাঁর কিছু ছবি দেখালেন, দিল্লি গিয়েছিলেন একসঙ্গে; সেইসব দেখতে দেখতে আমারও চোখ ভিজে এল। অনেকেই সেইসব ছবি মোবাইলে তুলে নিলেন। আরেক কার্যকর্তা, শুভঙ্করদার হাত ঘড়ি দেখালেন। কত যত্ন করে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছেন। অপহৃত হওয়ার আগে তাঁর বাড়িতে সবাই জামা কাপড় বদলে স্কুলে এসেছিলেন, তখন ওই হাত ঘড়িটা রয়ে যায়।

আমি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন মেজদাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, যতবারই মেজদা বাড়িতে আসত ততবারই বলত— তোর সেই বড়ো বড়ো হাতের লেখার চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সেই চিঠিটা কারুর কাছে খুঁজে পেতে চাইলাম। কিছু কিছু স্মৃতি বড্ড মনে দাগ কেটে যায়। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমার একটাই কথা বার বার মনে হচ্ছিল— কিছু মানুষ হারিয়ে গেলেও, তাদের দেখানো পথ কোনোদিনও হারায় না, আর সেই পথেই ত্রিপুরায় আজ সঙ্ঘ এত এগিয়েছে। আমি জানি না আগে ত্রিপুরা কেমন ছিল, কিন্তু এখন ত্রিপুরা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ সঙ্ঘের কাজে অনেক এগিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও এগোবে।

ত্রিপুরা ভ্রমণ শেষ করে আমরা শিলচরের দিকে রওনা দিলাম, মাঝে কানুদা নিজের বাড়িতে নেমে গেলেন। আমি বললাম, কানুদা আবার কবে দেখা হবে জানি না। ভালো থাকবেন, সদা হাস্যময় থাকবেন। শিলচরে বলরামদা থাকতেন, বর্তমানে তিনি যদিও পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ, তাই তাঁকে অসম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করতে হয়। শিলচরে আমরা রাত্রে ভোজনের জন্যে আমিতদার বাড়ি এলাম। তাঁর স্ত্রী মৌসুমীদি সেবিকা সমিতির একজন কার্যবাহিকা। পৌঁছে দেখি সুপর্ণাদিও উপস্থিত। তিনিও সেবিকা সমিতির কেন্দ্রীয়স্তরের কার্যবাহিকা। খাওয়া সেরে আমি সেবিকা সমিতির ছাত্রীনিবাসে রইলাম, আর বাকিরা গেলেন সঙ্ঘের নিবাসে। ছাত্রীনিবাস দেখে আমার ছোটোবেলায় ফেলে আসা সেই দিনগুলো মনে পড়ে গেল।

পরদিন ১৩ অক্টোবর ২০২২। ভোরবেলা উঠে ছাত্রীনিবাসেই প্রাতঃস্মরণ করলাম, প্রার্থনা করলাম, শারীরিক করলাম। মনটা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এরপর ওখান থেকে আমরা শিলঙের উদ্দেশে রওনা দিলাম। বলরামদা থেকে গেলেন শিলচরে। দুদিন আমরা শিলং ঘুরে এলাম গৌহাটিতে (১৫.১০.২২)। সেখানেও সেবাভারতীর ছাত্রাবাসে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছোটো ছোটো ছেলেরা কীভাবে পরিবেশন করছে, নিজেদের বাসন নিজেরা মেজে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখছে তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এরপর ওইদিন মা কামাখ্যাকে সুন্দর ভাবে দর্শন করে পরদিন (১৬.১০.২২) কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলাম। □

মোরবী সেতু দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে সহযোগিতায় স্বয়ংসেবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩০ অক্টোবর গুজরাটের মোরবীতে মচ্ছু নদীর উপর কেবল সেতু দুর্ঘটনায় ১৩৪ জনের বেশি মানুষ মারা যায়। ১৮০ জন দুর্ঘটনাগ্রস্তদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মোরবী সেতু দুর্ঘটনায় আহতদের প্রাণ বাঁচাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এবং অন্যান্য সংগঠনগুলির ভূমিকা প্রশংসনীয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সৌরাষ্ট্র প্রান্তের প্রচার প্রমুখ পঙ্কজ ভাই রাওয়াল জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় এই সেতু দুর্ঘটনা ঘটে। সেই সময় মোরবী বিভাগের সহ কার্যবাহ বিপুল ভাই দুর্ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে ছিলেন। উনি সেতু ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েই স্থানীয় অধিকারীদের সূচনা পাঠান। এরপর ১০ মিনিটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে স্বয়ংসেবকরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় ২০০ জন স্বয়ংসেবক সেদিন বিদ্যুৎ গতিতে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্বয়ংসেবকরা সেদিন এনডিআরএফ ও সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১২ ঘণ্টা কাজ করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক ললিতভাই, জেলা কার্যবাহ মহেশভাই ও বিপুল ভাই। যে সমস্ত শিশু ও ব্যক্তি মচ্ছু নদীর জলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তাদেরই আগে উদ্ধার করা হয়। তারপর একে একে তুলে আনা হয় মৃতদেহগুলি। অনেক স্বয়ংসেবক আহতদের নিয়ে সোজা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় সেদিন রোগীর তুলনায় চিকিৎসক কম। স্বয়ংসেবকরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও) এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর চিকিৎসকদের ফোন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসতে অনুরোধ করেন। ফলে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়।

এরই মধ্যে কিছু স্বয়ংসেবক নদী থেকে তুলে আনা মৃতদেহগুলি রাস্তায় এনে শববাহী গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করেন। তার জন্য রাস্তার যানজট নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতা করার কাজে লেগে পড়েন অনেকে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুর্ঘটনাগ্রস্তদের আত্মীয়-পরিজনেরা অকুস্থলে এসে ভিড় করেন। ক্রমে মানুষের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছায় যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খায় পুলিশ প্রশাসন। প্রিয়জনদের জন্য হতাশা ও দুশ্চিন্তায় হাহাকার করা আত্মীয়দের সামলানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এলেন স্বয়ংসেবকরা। যারা প্রিয়জনদের হারিয়ে কাতর হয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন স্বয়ংসেবকরা। এমনকী মরদেহ দায়িত্ব সহকারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা।

অ্যাম্বুলেন্সে মৃতদেহ রাখার আগে তা সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা ছিল আরেকটা বড়ো কাজ। এই দায়িত্বও ভালোভাবে পালন করেছেন স্বয়ংসেবকরা। তাঁরা নিজেদের কাছে থাকা টাকা দিয়ে কাপড় কিনে নিজেরাই শবগুলিকে ঢেকে গাড়ি করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। স্বয়ংসেবকরা ৩৭ জন ইসলাম মতাবলম্বীর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। তারপর তাঁদের রীতি-রেওয়াজ অনুসারে সম্মানের সঙ্গে সেই দেহগুলি তাদের পরিজনদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। এই উদ্ধার ও সেবাকাজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল ও স্বামী নারায়ণ সঙ্ঘের সদস্যরা সংঘের স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতা করেন। ❑

জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নে ৫০০ প্রকল্প মোদী সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা।। জম্মু ও কাশ্মীর এতদিন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যে সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ছিল, ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের পর এবার জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষও উন্নয়নের অধিকার ভোগ করছেন। স্বাধীনতার পর বিগত ৭০ বছরে মাত্র ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল কাশ্মীরে। সেখানে নরেন্দ্র মোদী সরকার তিন বছরে ৫৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হয়েছে। যে কাশ্মীর সন্ত্রাসের আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছিল, তা ক্রমশ পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যস্থল হয়ে উঠছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর তিন দিনের সফরে উন্নয়নমূলক ৫০০ প্রকল্প চালু করেছেন। গত ৪ অক্টোবর জম্মুতে ১৯৬০ কোটি টাকা মূল্যের ২৬৩ টি প্রকল্প উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরের দিন বারমুল্লায় মোট ২০০০ কোটি টাকার ২৪০টি প্রকল্পের সূচনা ও ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘এর আগে কাশ্মীরে জামহুরিয়ত অর্থাৎ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ছিল মাত্র তিনটি পরিবার, ৮৭ জন বিধায়ক ও ৬ জন সাংসদ। এরাই গোটা কাশ্মীরের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতো। ৫ আগস্ট ২০১৯-এর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রামের পঞ্চ, সরপঞ্চ, বিডিসি এবং জেলা পঞ্চায়েতে ৩০ হাজার মানুষকে প্রকৃত গণতন্ত্র এনে দিয়েছেন। আগে উপত্যকার যুবকরা শিক্ষার বদলে হাতে পাথর ও বন্দুক তুলে নিত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের হাতে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং বই তুলে দিয়েছেন।’’ সন্ত্রাসের নামে যে কাশ্মীরের মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একসময় উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ লোপের পর ভারত সরকার সেখানে উন্নয়নের অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হয়েছেন কাশ্মীরের সাধারণ মানুষও।

ইটানগরে রাজ্যের প্রথম গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

পিআইবি।। উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আনতে ইটানগরে দোন্যি পোলো বিমানবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত করল ভারত সরকার। গত ১৯ নভেম্বর দোন্যি পোলো বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওইদিন রাজ্যের প্রথম গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর দোন্যি পোলো সর্বসাধারণের পরিষেবার উদ্দেশে খুলে

দেওয়া হয়। বিমানবন্দরটি ৬৯০ একর জমির উপর ৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। রানওয়ের দৈর্ঘ্য ২৩০০ মিটার। সবরকম আবহাওয়ায় চলাচলের অনুকূল এই বিমান বন্দর। বিমানবন্দরের টার্মিনাল আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে আছে শক্তি সাশ্রয়ী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের সুযোগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘‘ইটানগরের নতুন এই গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি বাণিজ্য ও পর্যটনেও গতি আনবে। সেই সঙ্গে অরুণাচলের সামগ্রিক অঞ্চলের উন্নয়ন হবে। অরুণাচলবাসীর সমস্ত সমস্যার সমাধানে বদ্ধপরিকর সরকার। আমাদের সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয় না।’’

ভারতে তৈরি আইফোন রপ্তানি হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করল

বিশেষ সংবাদদাতা।। আইফোন তৈরিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভারত। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের আইফোন রপ্তানি করেছে ভারত। মেড ইন ইন্ডিয়া আইফোন পাঠানো হয়েছে ইউরোপ

এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে। অনুমান করা হয়েছে ২.৫ বিলিয়ন ডলার বা আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকার আইফোন ২০২৩ সালের মধ্যে ভারত থেকে রপ্তানি করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারত ১.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইফোন রপ্তানি করেছিল। ২০১৭ সাল থেকে তাইওয়ানের কোম্পানি ফক্সকন, পেগাট্রন ও ভিস্তান ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া-মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড পরিকল্পনার অধীনে ভারতে আইফোন তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই আইফোন তৈরিতে অন্যান্য দেশের আধিপত্য হ্রাস করেছে ভারত। শীঘ্রই সারা বিশ্বের বাজার দখল করবে মেড ইন ইন্ডিয়ার আইফোন।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ২১ ।।

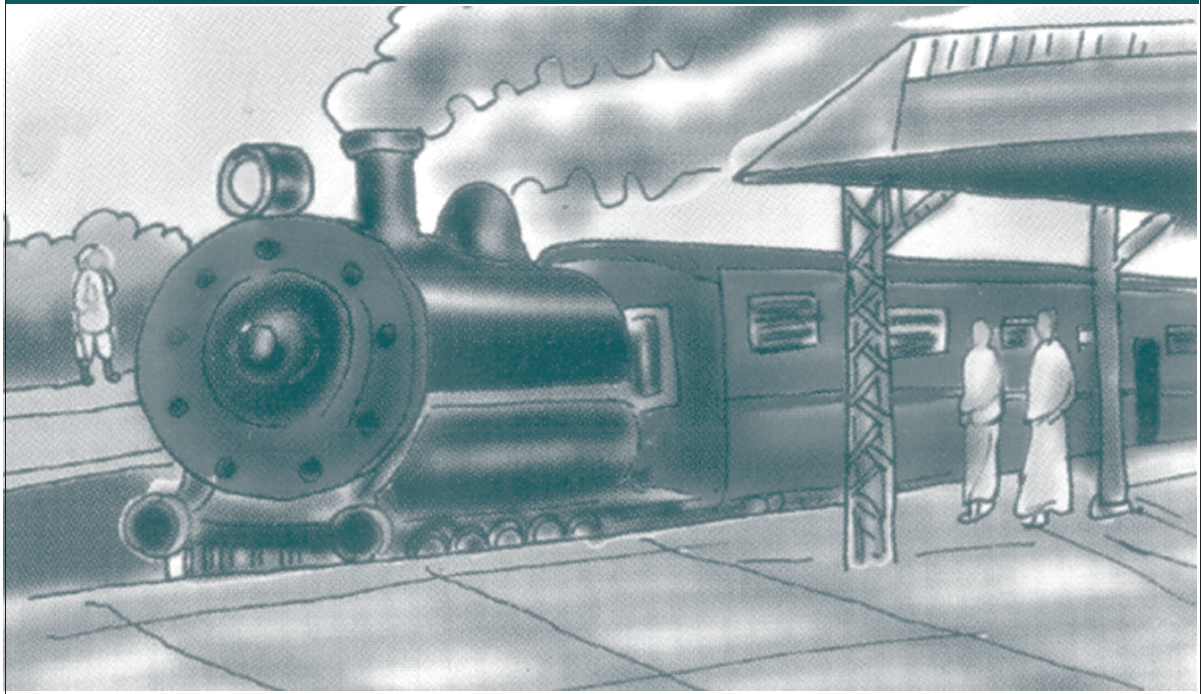

১৯৩৩ সালের আগস্ট মাস। ২৮ বছরের যুবক মহানামব্রতজী প্রস্তুতি নিলেন আমেরিকা যাত্রার। এক ভক্তের দেওয়া টাকায় ট্রেনে বম্বে (মুম্বই) পর্যন্ত পৌঁছানো গেল। কিন্তু এখনও যে অনেক টাকার দরকার!

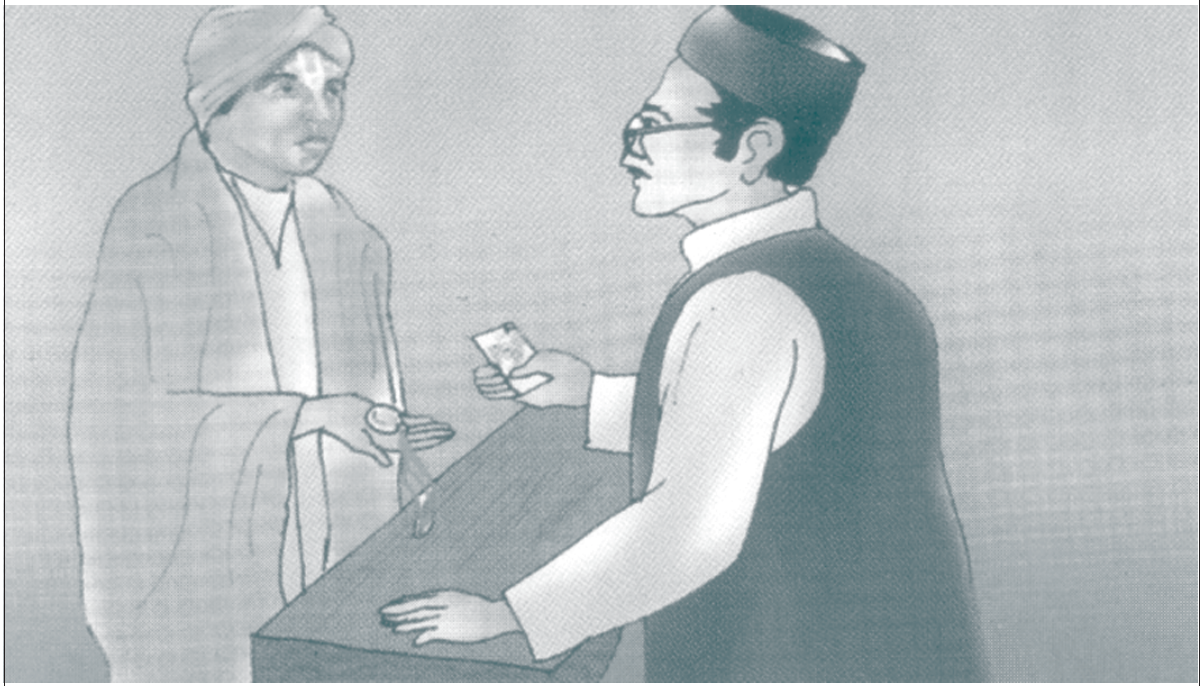

নিজের পাওয়া সোনার মেডেলটি বম্বের শিবুবাবু নামে একজনের কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা পাওয়া গেল। এদিক ওদিক থেকে সামান্য কিছু সংগ্রহ হলো। ইটালির জেনোয়া শহরে এই সামান্য টাকা নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

(ক্রমশ)